আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী

শ্রীনলিনী কুমার ভদ্র

মডার্ণ পাবলিশার্স

[illegible] বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক : শরৎ দাস
মডার্ণ পাবলিশার্স
৬, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬
দাম—দুই টাকা

মুদ্রাকর :
কালীপদ চৌধুরী
গণশক্তি প্রেস
৮-ই, ডেকার্স লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ পত্র

শ্রীমতী রাণী ভদ্র

কল্যাণীয়াসু,

মায়াবাদী সন্ন্যাসীর সহচর পর্ব্বতচারী অরণ্যবাসীকে তুমি করিয়াছ গৃহবাসী। গৃহ-প্রাচীরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে 'আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী'দের সাহচর্য্যে একদা যে মুক্ত জীবনানন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম তাহার বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ কাহিনীটি তোমার হাতেই তুলিয়া দিলাম।

ইতি।

অবতরণিকা

আসাম এবং সিংভূমের অরণ্য-পর্ব্বতে বিভিন্ন আদিম জাতির সাহচর্য্যে দীর্ঘকাল কাটাইবার সুযোগ আমার হইয়াছিল, এই সমস্ত আদিবাসীদের মধ্যে আসামের মণিপুরীদের সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত 'বিচিত্র মণিপুর' নামক ভ্রমণ-কথায় আমি লিপিবদ্ধ করি। সুখের বিষয় এক বৎসর যাইতে-না-যাইতেই ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। আদিম জাতি সম্বন্ধে লিখিত আমার প্রথম পুস্তকখানি এমনি ভাবে পাঠক-মহলে আশাতীত সমাদর লাভ করায় আমি এ সম্বন্ধে আমার অন্যান্য প্রবন্ধসমূহকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হইয়াছি।

অরণ্যচারী আদিম জাতিসমূহের মধ্যে যাহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আমি আসিয়াছিলাম কেবলমাত্র তাহাদের কথাই বর্ত্তমান পুস্তকে বিবৃত করিয়াছি। আসামের আদিবাসীদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদি বর্ণনে আসাম গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত জাতিতত্ত্ব বিষয়ক প্রকরণ-গ্রন্থ (Monograph) সমূহই আমার প্রধান উপজীব্য হইয়াছে। কার্য্যব্যপদেশে সিণ্টেং এবং হালাম এই দুইটি জাতির মধ্যে দীর্ঘকাল আমাকে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধে যে-সমস্ত

তথ্য এবং বৃত্তান্ত বর্ত্তমান পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার অধিকাংশই আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-লব্ধ। Major Gurdon-এর The khasis নামক পুস্তকে সিণ্টেংদের কথা পাই, কিন্তু হালামদের বিবরণ কোনো নৃতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে আমার নজরে পড়ে নাই।

এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধই ইতিপূর্ব্বে 'প্রবাসী' 'অলকা' 'যুগান্তর' ইত্যাদি বিভিন্ন মাসিক ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকখানা প্রকাশ করিতে গিয়া আজ বার বার মনে পড়িতেছে খাসিয়া পাহাড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত স্বামী প্রভানন্দের কথা। তাঁহারই আহ্বানে প্রথম যৌবনে একদিন ঘরের মায়া কাটাইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক প্রচারকরূপে খাসিয়া পাহাড়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পদব্রজে পর্য্যটন করিয়াছিলাম। আমার সেই ভ্রাম্যমাণ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আমার প্রমুখাৎ শুনিয়া যিনি আমাকে দিয়া 'অরণ্যের মায়া' (বহুকাল পূর্ব্বে 'যুগান্তরে' প্রকাশিত ও ভিন্ন নামে বর্ত্তমান পুস্তকে সন্নিবিষ্ট) লিখাইয়াছিলেন সেই উদীয়মান নাট্যকার মন্মথকুমার চৌধুরীর নিকট আমার অপরিশোধ্য ঋণের কথা এই অরণ্য-ভ্রমণ-কাহিনীর ভূমিকায় কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার না করিলে বন্ধুকৃত্য সম্পাদনে ত্রুটি হইবে। ভ্রমণ-বিলাসী এবং ভ্রমণ-কাহিনী পাঠে অনুরাগী অনুজ শ্রীমান স্বদেশরঞ্জন ভদ্রের উৎসাহ এবং আগ্রহও আমাকে এই পুস্তক-রচনায় কম অনুপ্রাণিত করে নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল নানা ভাবে পরামর্শাদি দিয়া আমাকে ঋণী করিয়াছেন। পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও 'প্রবাসী' এবং 'মডার্ণ রিভিয়ু' সম্পাদক, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্লকগুলি ব্যবহার করিতে দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকের নামকরণের জন্য আমি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী মহাশয়ের

নিকট ঋণী। 'দলমা অভিযাত্রী' নামক প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট ছবিগুলির মধ্যে তিনটি Tisco review হইতে গৃহীত, বইয়ের বাকী ছবিগুলি আমার নিজের তোলা।

কিছুকাল যাবৎ ভারতের জাতীয় মহাসমিতি আসামের এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের আদিম জাতিদের সমস্যা সম্বন্ধে কতকটা সজাগ হওয়ার দরুণ ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান পুস্তকে বাংলাদেশের নিকট-প্রতিবেশী, আসাম ও সিংভূমের কতকগুলি আদিম জাতির কথা লিপিবদ্ধ হইল। ইহা পাঠে যদি পাঠকদের মধ্যে আমাদের উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত "অপরিচিত প্রতিবেশী"দিগকে ভালো করিয়া জানিবার ও বুঝিবার জন্য প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয় তাহা হইলেই আমি আমার এই অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যিক প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই বলিয়া মনে করিব।

৩০, রামমোহন সাহা লেন
কলিকাতা,
১৩ই শ্রাবণ, ১৩৫৩

শ্রীনলিনী কুমার ভদ্র

সূচীপত্র

আসাম

(১ম খণ্ড)

সিংভূম

(২য় খণ্ড)

আমাদের
অপরিচিত প্রতিবেশী

(১)

আসাম প্রদেশে ভ্রমণকালে একদিকে যেমন ইহার অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হৃদয়কে বিস্ময়ে অভিভূত করে, অন্যদিকে তেমনি সেখানকার অরণ্য-পর্ব্বতের অধিবাসী আদিম জাতিদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিও মনে বিশেষ কৌতূহলের সঞ্চার করে। বাস্তবিক এ প্রদেশে যত বিচিত্র আদিম জাতির বাস, ভারতবর্ষের আর কোথাও তত নহে। ইহারা আমাদের নিকট প্রতিবেশী, অথচ ইহাদের সম্বন্ধে খুব কম খবরই আমরা রাখি। আসামের অন্যতম আদিম জাতি, মণিপুরীদের মধ্যে মহাপ্রভুর বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার বাংলার ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অধ্যায়, অথচ সে সম্বন্ধে আমরা, সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীরা—খুব যে ওয়াকিফহাল তাহা নয়। সুদীর্ঘকাল যাবৎ মণিপুরীদের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতিগত সুদৃঢ় যোগসূত্র স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের রীতি-নীতি ইত্যাদি

সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধিৎসা আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয় নাই। শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মণিপুর আক্রান্ত হইবার পর এই আদিম জাতিটি সম্বন্ধে হঠাৎ আমরা কুতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলাম। পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহ্রুর সাম্প্রতিক আসাম ভ্রমণের ফলে খাসিয়া নাগা প্রভৃতি আসামের অন্যান্য আদিম জাতির প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। *

আসামের আদিবাসীদের প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী বলিয়াছেন—"যখন ইহাদের কথা আমি জানিতে পারিয়াছি তখন হইতেই ইহাদের সম্বন্ধে আমি গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছি। ইহাদের আচার-ব্যবহার আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে এবং আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে আদিম জাতিদের সম্বন্ধে আমাদিগকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে হইবে এবং তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে হইবে। নিজেদের আদর্শ অনুযায়ীই যাহাতে তাহারা উন্নতিলাভ করিতে পারে, সে বিষয়েই আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত। তাহারা যে-ধরণের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া, জোর করিয়া তাহাদের সংস্কার করিতে গেলে প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।"

পণ্ডিত নেহ্রুর উপরিউক্ত কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই আদিম জাতিদেরও একটা নিজস্ব ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি আছে। আবহমানকাল হইতে জাতীয় আদর্শের অনুসরণ করিয়াই তাহারা চলিয়া আসিতেছিল। হয়তো ইহাদের সমাজে অনেকগুলি কুপ্রথাও ছিল—যেমন নাগাদের মধ্যে নরমুণ্ডচ্ছেদের প্রথা, নরহত্যা করিতে সক্ষম না হওয়া

* ১৩৫২ সালের পৌষ মাসে পণ্ডিতজীর আসাম ভ্রমণের অব্যবহিত পরে প্রবন্ধটি লিখিত।

পর্য্যন্ত কোনো-কোনো সম্প্রদায়ের বিবাহেচ্ছু নাগা-যুবকের পক্ষে পাত্রী জোটানোই ছিল অসম্ভব। এ সমস্ত অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া একথা মনে করিলে ভুল করা হইবে যে, ইহাদের সমাজে ভালো কিছুই নাই। বস্তুতঃ ইহাদের অনেক সামাজিক রীতি-নীতি তলাইয়া দেখিলে মনে হয় যে, অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া ইহাদিগকে অবজ্ঞা করা অনুচিত। জওয়াহরলাল সত্যই বলিয়াছেন :—"অনেক দিক দিয়াই আমরা ইহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই।" এই উক্তি যে কতদূর সত্য, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাহার সাক্ষ্য দিতে পারি। আসামের অরণ্য-পর্ব্বতে আদিম জাতিদের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটাইবার সুযোগ বর্ত্তমান লেখকের হইয়াছিল। তখন ইহাদের চরিত্রগত এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমার নজরে পড়ে, যাহা আমাদের তথাকথিত সভ্যসমাজে সুদুর্লভ। খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পাহাড়ের দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণ-কালে সেখানকার অধিবাসীদের নিকট যে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার পাইয়াছি, তাহা জীবনে ভুলিবার নহে। স্বামী প্রভানন্দের সঙ্গে খাসিয়া পাহাড়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছি। এই ভ্রমণ-পথের চতুষ্পার্শ্বে গর্জ্জমান গিরিনির্ঝরিণী, সুদূরপ্রসারিত নিবিড় অরণ্যানী, মনোরম পাইনকুঞ্জ, উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ যেমন একদিকে আমাদের নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি মনকে মুগ্ধ করিয়াছে অরণ্যচারী খাসিয়া নরনারীদের মধুর ব্যবহার। বিদেশী বলিয়া ইহারা আমাদিগকে অবজ্ঞা করে নাই, পরম সমাদরে কুয়াই (পান-সুপারি) দিয়া অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদের কুটীরে আশ্রয় দিয়াছে। পাহাড়ের যে-সমস্ত নিভৃত অঞ্চলে আধুনিক সভ্যতার চিত্তবিভ্রান্তকারী রশ্মিচ্ছটা প্রবেশ করে নাই, সেখানকার অধিবাসীরা অতিথিকে আজও দেবতার মত ভক্তি করিয়া থাকে, তাহাদের কুটির-প্রাঙ্গণ হইতে অতিথি কখনো বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায় না।

অতিথি-সেবার এই উচ্চ আদর্শই রূপায়িত দেখিতে পাই 'পান তামাকের জন্মকথা' নামক খাসিয়া রূপকথায়। ইহাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য একটি ব্যক্তিগত কাহিনীর উল্লেখ করিব। ১৩৪৫ সালের কথা। অভ্রখনির সন্ধানে দুইজন সহযাত্রী সহ চলিয়াছি খাসিয়া পাহাড়ের পাঁচ হাজার ফুট উর্দ্ধে পাড়ু নামক স্থানের উদ্দেশে। অপরাহ্নকালে পর্ব্বতগাত্রস্থ এক বিরাট্ শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করিয়া সুরু করিলাম চড়াই পথ বাহিয়া পর্ব্বতারোহণ। হঠাৎ পিছনে শুনি বামাকণ্ঠে মামা ডাক—(খাসিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বাঙালী মাত্রকেই মামা সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া থাকে)। পিছন ফিরিয়া দেখি বোঝার ভারে, অবনতপৃষ্ঠ এক খাসিয়ানী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। কাছে আসিয়া একখানা রুমাল দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উনে উ লং জং ফি ?"—"এটা কি তোমার ?" জবাব দিলাম—"খুব্লেই মামী, উনে জং গা !" "ধন্যবাদ মামী, এটা আমারই"। বলা আবশ্যক রুমালটিতে বাঁধা ছিল রাহা-খরচের সব টাকাকড়ি। শুধু এই একটি ঘটনায়ই নয়, বহু ব্যাপারে আদিম জাতিদের পরদ্রব্যে নির্লোভতার পরিচয় পাইয়া বারবার আমি বিস্মিত হইয়াছি। কেমন করিয়া পরের জিনিষ আত্মসাৎ করিতে হয়, সেই মহাবিদ্যাটি এই সমস্ত আদিম জাতির লোকেরা আজো শেখে নাই। অথচ আমাদের সভ্য সমাজে নিপুণ ভাবে পরস্বাপহরণ যে তথাকথিত বড়লোক হইবার একটি প্রধান উপায় তাহা তো আমরা প্রতিনিয়ত চোখের সামনেই দেখিতেছি। সুতরাং এই মহাবিদ্যায় যাহারা পোক্ত হইতে পারিল না, তাহারা অসভ্য বৈ কি !

আমাদের সভ্য সমাজের শাস্ত্রবাক্য 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ'—কিন্তু ইহা কার্য্যতঃ মানিয়া চলে এই সমস্ত আদিবাসীরা। শুধু খাসিয়া নহে, অন্যান্য আদিম জাতির মধ্যেও এই গুণটির পরিচয় পাওয়া যায়। বিগত

মহাযুদ্ধের সময় বিষেণপুর-শিলচর রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া যিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সেই চ্যাপমান সাহেব তাঁহার 'লাম্পি' নামক পুস্তকে নাগাদের এই গুণটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। নাগাদের সততা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল ; তাই তিনি বলিয়াছেন, 'it is a revelation to me.'

বাস্তবিক নাগা খাসিয়া প্রভৃতি আদিবাসীদের স্বভাব আচরণ ইত্যাদির কথা যদি আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। প্রতারণা ইহারা জানে না, মিথ্যা কথা ইহারা বলে না ; সততা সরলতা ও আন্তরিকতা ইহাদের স্বভাবসিদ্ধ। অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারিণী ও রূপ-লাবণ্যবতী খাসিয়া মেয়েদের দেখিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়। ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজ হাট-বাজার ইত্যাদি মেয়েরাই করিয়া থাকে। এক মণ দেড় মণ বোঝা পিঠে করিয়া তাম্বুল-রাগে রঞ্জিতাধরা খাসিয়ানীদের একদিনে ত্রিশ-বত্রিশ মাইল পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। এত কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও কিন্তু ইহাদের জীবনে আনন্দের অভাব নাই, তাদের অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাসে গিরি-বনানী নিত্য মুখরিত।

(২)

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই সকল আদিম জাতি নিজেদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পূজা-পার্ব্বণ, আমোদ-উৎসব ইত্যাদি লইয়া নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কোন্ অশুভ ক্ষণে জানিনা 'সাত সমুদ্র তের নদীর পার' হইতে আগত খ্রীষ্টান মিশনারীরা ইহাদিগকে 'অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার' জন্য নিভৃত পার্ব্বত্য অঞ্চলসমূহে আসিয়া শুভ পদার্পণ করিয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী প্রচার-কার্য্যের ফলে ইহারা শুধু খাসিয়া নহে, আসামের প্রায় সমস্ত

আদিম জাতিকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া যীশু ভজাইতে সমর্থ হইয়াছে ইহার ফল আদিম জাতিদের পক্ষে কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহা বিস্তারিত ভাবে বলিবার স্থান ইহা নয়। শুধু একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই বিকৃত আদর্শ ও বিজাতীয় ধর্ম্ম তাহাদের মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙিয়া দিয়াছে। ভয়াবহ পরধর্ম্মের অনুসরণকারী কুকিজাতির শোচনীয় দুরবস্থার কাহিনী লালতুদাই রায় মহাশয় "আসামের কুকিজাতি" নামক প্রবন্ধে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। নাগাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য মিশনারীরা কিরূপ জঘন্য এবং হীন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহা তাহাদেরই জাতভাই প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ মিল্‌স সাহেব 'The Ao Nagas' পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। খাসিয়া পাহাড়ে প্রচারক-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে একথা বলিতে পারি যে, খ্রীষ্টান মিশনারীরা ধর্ম্ম-প্রচারের নামে আদিম জাতিদের যতদূর অনিষ্ট করিয়াছে, দেড় শত বৎসরের ইংরেজ শাসনও বোধ করি, আমাদের ততটা অপকার করে নাই। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, ইহাদের শিক্ষায় আদিবাসী মেয়েদের মধ্যে একনিষ্ঠতার আদর্শটা পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। আসামের আদিম জাতিসমূহের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা সচেতন ছিলাম না বলিয়াই খ্রীষ্টান মিশনারীরা আমাদের পরস্পরের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাদের প্রচার-কার্য্যের ফলে আদিবাসীরা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, তাহারাও ভারতবাসী, ভারতবর্ষের পতন-অভ্যুদয়ের সঙ্গে তাহাদেরও ভাগ্য বিজড়িত। কিন্তু সম্প্রতি পণ্ডিত জওয়াহরলাল কংগ্রেসের বাণী শুনাইয়া তাহাদিগকে নূতন আলোকের সন্ধান দিয়া আসিয়াছেন। ভারতবর্ষের আসন্ন স্বাধীনতা-সংগ্রামে হয়তো নবীন আশায় উদ্দীপ্ত এই আদিম জাতিসমূহের ভিতর হইতে শত শত বীর সৈনিকের অভ্যুদয় হইবে। দেশহিতৈষী মাত্রকেই

আজ মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাদিগকে যদি আমরা ঘৃণা করিয়া দূরে সরাইয়া রাখি, তাহা হইলে আমাদের মহাজাতি গঠন-কার্য্য ব্যাহত হইবে। হরিজন সমস্যা লইয়া সমগ্র দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু আদিম জাতিদের কথা ভাবিয়া কয়জন দেশ-নেতা মাথা ঘামাইতেছেন? জওয়াহরলালের সময়োপযোগী উক্তিতেও কি তাহাদের চৈতন্যের উদ্রেক হইবে না?

সিণ্টেংদের দেশে

আসামের আদিম জাতিদের মধ্যে সিণ্টেংদের দেশেই দীর্ঘকাল বাস করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। সুতরাং প্রথমে সিণ্টেংদের সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই বর্ণনা করিতেছি।

প্রথম যৌবনে যেদিন ঘরের মায়া কাটাইয়া অজানার আকর্ষণে নিরুদ্দেশ যাত্রা করি সেদিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই যে, আমার যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলা অতিবাহিত হইবে আসামের অরণ্য-পর্ব্বতে আদিবাসীদের সাহচর্য্যে। ভবঘুরের মত দীর্ঘকাল নানা জায়গায় ঘোরা-ঘুরি করিয়া অবশেষে আসিয়া উপস্থিত হইলাম খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পাহাড়ের পাদদেশস্থ শেলা নামক স্থানে। আশ্রয় জুটিল স্বামী প্রভানন্দ-প্রতিষ্ঠিত সেখানকার রামকৃষ্ণ আশ্রমে। খাসিয়াদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে স্বামীজীর অক্লান্ত প্রচেষ্টার কথা কাগজে পড়িয়াছিলাম এবং লোক-মুখেও শুনিয়াছিলাম; এবার তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলাম।

ছোট একটি পাহাড়ের উপর শেলা রামকৃষ্ণ আশ্রমটি অবস্থিত, গিরিপাদমূল ধৌত করিয়া স্বল্পতোয়া একটি পাহাড়ী নদী প্রবহমান। জায়গাটির মনোরম প্রাকৃতিক আবেষ্টন আমাকে মুগ্ধ করিল। ভাবিলাম এখানকায় নিভৃত নির্জ্জনতায় জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাইয়া দিলে মন্দ কি!

জৈন্ত্যা পাহাড়ের একটি দৃশ্য

বেশ আরামেই দিন কাটিতেছিল, হঠাৎ একদিন স্বামীজী খাসিয়া পাহাড়ে তাঁহার আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনে সহযোগিতা করিতে আমাকে অনুরোধ করিলেন, তাঁর একান্ত ইচ্ছা সিণ্টেংদের দেশ জোয়াইয়ে গিয়া :পাহাড়ীদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারে আমি আত্মনিয়োগ করি। স্বামীজী বলিলেন যে, আমাকে সঙ্গে করিয়া তিনি শিলঙে লইয়া যাইবেন এবং সেখান হইতে খাসিয়াদের সঙ্গে আমাকে জোয়াইয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। স্বামীজীর কথায় আমি সানন্দে সম্মতি প্রদান করিলাম। স্থির করিলাম, আদিম জাতিদের

মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি প্রচারই হইবে আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।

স্বামীজীর নিকট ভ্রমণ-পথের বর্ণনা শুনিয়া আমার রক্তে দোলা লাগিল। দিনের পর দিন দুর্গম পার্ব্বত্য পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে জোয়াইয়ে পৌঁছিতে হইবে, পার্ব্বত্য পথের বাঁকে বাঁকে না জানি কত নব নব বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। কথনো আশ্রয় জুটিবে গিরিসানুদেশে খাসিয়াদের কুটীরে, কখনো বা রাত্রিযাপন করিতে হইবে পর্ব্বত-গাত্রস্থ নিবিড় অরণ্যানীর ক্রোড়ে। অরণ্যের আকর্ষণ আমার নিকট দুর্ব্বার। আশৈশব অরণ্য-বিহারের স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছি, আমার সেই আবাল্যপোষিত স্বপ্ন এতদিন পরে বাস্তবিকই বুঝি সফল ও সার্থক হইতে চলিল। গিরি-অভিযানে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য অধীর আগ্রহে আকুল হইয়া উঠিলাম।

দিনকতক শেলাতে কাটাইবার পর একদিন স্বামীজীর সঙ্গে পদব্রজে জোয়াইয়ের উদ্দেশে রওনা হইলাম।

শেলা গ্রামটি ছাড়াইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই সুরু হইল আন্দাজ আড়াই হাজার ফুট উঁচু এক খাড়া চড়াই। চড়াইটি পার হইয়া মুস্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া আমরা চারিদিকে পাথরের দেওয়ালে ঘেরা এক তক্‌তকে-ঝকঝকে প্রশস্ত স্থানে একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। অনতিদূরে জনকতক খাসিয়া জটলা করিয়া বসিয়াছিল। আমি তাহাদিগকে নিকটে আসিবার জন্য ইসারা করিলাম। তাহারা আসিয়া এক-এক জন করিয়া ‘খু-ব্লেই’ এই দুইটি শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক আমাদের সঙ্গে করমর্দ্দন করিতে লাগিল, ইহাই খাসিয়াদের অভিবাদন-প্রণালী। কথা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিলেন,

এই অঞ্চলের বহু গ্রামেই এই ধরণের এক একটি প্রাচীরবেষ্টিত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতে হইলে গ্রামের মাতব্বররা না কি এই জায়গাগুলাতে আসিয়া জমায়েৎ হন, নানা উৎসব উপলক্ষে এগুলাতে নাকি নৃত্যাদিও হইয়া থাকে।

সারি নদীর উপর সেতু

বেলা পাঁচটা নাগাদ 'নংওয়ারে' রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের শিক্ষক বন্ধুবর শশীন্দ্র সোমের বাসায় আসিয়া আশ্রয় লইলাম।

সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে একান্তে এক অত্যুচ্চ স্থানে, একখানা সমতল শিলাখণ্ডে আসিয়া বসিলাম। সম্মুখে গভীর খদ। খদের ও-পারে নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা সুদূরবিস্তৃত পাহাড়শ্রেণী। ঐ পাহাড়শ্রেণীর পিছনে দিগন্তলীন একটি নীল পাহাড়ের গা বাহিয়া রজত-রেখার মত দুইটি ঝরণাধারা নিম্নে গড়াইয়া পড়িতেছে। তন্ময় হইয়া এই দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলাম, কিন্তু সূর্য্য অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নিবিড় অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। আমি তখন অগত্যা

সে জায়গা হইতে উঠিয়া বিজন বনপথ দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আমরা চেরাপুঞ্জীর উদ্দেশে রওনা হইলাম। রাস্তার দু'-ধারের দৃশ্য পরম রমণীয়। পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত গির্জ্জাগুলি মাঝে মাঝে নজরে পড়িতে লাগিল। কয়েকটি চড়াই-উৎরাই পার হইয়া আমরা টার্ণা গ্রামের কাছে আসিয়া পৌছিলাম। টার্ণার নিকট চেরাপুঞ্জীর রাস্তাটি ডান-দিকে বাঁকিয়া খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়া উঠিয়াছে। এই চড়াইটির মাথায় পৌছিবার পর চারিদিকের নৈসর্গিক শোভা দেখিয়া পথের শ্রান্তি যেন এক নিমেষে বিদুরিত হইয়া গেল। বামে ঢেউ-খেলানো সুনীল পাহাড়শ্রেণী নীল আকাশের গায় হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিখরদেশ হইতে শিবজটা-নিঃসৃত জাহ্নবীধারার মত কত রজতশুভ্র জলধারা গিরি-পাদমূলে গড়াইয়া পড়িয়া উপলখণ্ডসমূহের বাধা অতিক্রম করিয়া সগর্জ্জনে বহিয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে দূরে, বহুনিম্নে সিলেটের সুবিস্তীর্ণ সমতলভূমি সুদূর দিগন্তে গিয়া মিশিয়াছে।

চড়াইটি পার হইয়াই আমরা যে-গ্রামে পৌছিলাম সেইটির নাম মাউ-ম্লু। মাউ-ম্লুতে দেখিলাম এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে খাসিয়াদের তীর-খেলা সুরু হইয়াছে। এক-এক জন করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে তীর ছুঁড়িতেছে, খেলোয়াড়দের মধ্যে কেহ লক্ষ্যভেদ করিবামাত্র সমবেত দর্শকমণ্ডলী উচ্চকণ্ঠে হর্ষধ্বনি করিতেছে। শুনিতে পাইলাম ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের দুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে।

তীরখেলা খাসিয়াদের সর্ব্বপ্রধান জাতীয় ক্রীড়া। ক্রীড়াশেষে বিজয়ী দল নৃত্য এবং ঘন ঘন আনন্দধ্বনি করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়া যায়, তখন যুবতী রমণীরা সমবেত হইয়া তাহাদের চিত্তরঞ্জনের জন্য

সাধ্যমত প্রয়াস পায় এবং একান্ত আগ্রহসহকারে আদ্যোপান্ত প্রতি-যোগিতার বিবরণ শ্রবণ করে।

মাউ-ম্লু হইতে সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের উপর দিয়া সমান রাস্তা আরম্ভ হইল। প্রায় মাইল-দেড়েক চলিবার পর চেরাপুঞ্জীতে পৌঁছিয়া আমরা খাসিয়া পাহাড়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক, আচার্য্য শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শৈলনিবাস নামক ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। পরদিন বেলা প্রায় পাঁচটার সময় মোটরে শিলঙে পৌঁছিলাম।

শিলঙে পৌঁছিয়াই খবর পাইলাম যে, দিন-কয়েকের মধ্যেই 'স্মিট' নামক স্থানে 'নংক্রেমের পূজা' এবং তদুপলক্ষে খাসিয়া মেয়েদের নাচ হইবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে ভোরবেলা হইতেই দলে দলে খাসিয়া, নেপালী, বাঙালী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় নরনারী পূজা ও নাচ দেখিবার জন্য শিলং হইতে রওনা হইল। আমিও পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণজী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হিন্দু অনাথ আশ্রমের এক পণ্ডিতজীর সঙ্গে স্মিটে পৌঁছিয়া সিম-* পুরোহিত্রীর বাটীর সম্মুখস্থিত বেড়া-ঘেরা এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। সেখানে প্রকাণ্ড জনতা। প্রাঙ্গণের এক-দিকে পুরুষ এবং অন্যদিকে স্ত্রীলোকেরা বসিয়াছে। মাঝখানে প্রায় পঞ্চাশটি যুবতী নৃত্য করিবার জন্য সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেখানে বাস্তবিকই যেন সৌন্দর্য্যের হাট খুলিয়া গিয়াছে। মেয়েরা প্রায় সকলেই বেশ সুন্দরী। পরনে তাহাদের দামী সিল্কের শাড়ী, গায়ে রঙীন জ্যাকেট, গলায় সোনা এবং প্রবালে তৈরী কণ্ঠহার, কানে সোনার মাকড়ি, হাতে রূপার চুড়ি, বক্ষে সোনা অথবা রূপার দীর্ঘ চেন বিলম্বিত। সকলেরই মাথায় একই ধরণের সোনা অথবা

* খাসিয়া রাজাকে 'সিম' বলা হয়।

রূপার মুকুট এবং এক এক গাছি দীর্ঘ বেণী প্রত্যেকেরই পৃষ্ঠে দোলায়িত। আপাদমস্তক তাহাদের বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত। বাহু দুটি দুই পার্শ্বে ঝুলানো, দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ।

একটু পরে খুব আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহারই নাম না-কি 'কা সাড্ কম্বেই' বা মেয়েদের নৃত্য। রাজ-পরিবারের কয়েকটি মেয়েও এই নৃত্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মাথার উপর ছাতা ধরিয়া কয়েক জন লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। অদূরস্থিত এক উঁচু মঞ্চের উপর হইতে সানাই, ঢাক, করতাল ইত্যাদি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ কানে ভাসিয়া আসিতেছিল। এক সময়ে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া মেয়েদের বেশভূষার একটু পরিপাট্য সাধন করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আসিল বীরবেশে সজ্জিত আট-দশ জন খাসিয়া, মাথায় তাহাদের গেরুয়া রঙের পাগড়ীর উপর সাদা এবং কালো রঙের মুরগীর পালকের তৈরি মুকুট, গায়ে জরীর কাজ করা রঙীন জামা, পরনে রঙীন বস্ত্র। পিঠে, অস্ত্র এবং পাখীর পালকে পূর্ণ তূণ। পায়ে এক-এক জোড়া প্রকাণ্ড বুট জুতা। সকলকারই এক হাতে চামর ও অন্য হাতে তলোয়ার। বীরবেশধারীরা প্রথমে কিছুক্ষণ চামর দোলাইয়া বীরত্বব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গীসহকারে নৃত্য করিতে করিতে প্রাঙ্গণের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, অবশেষে দুই-দুই জন করিয়া অসিযুদ্ধের অভিনয়পূর্ব্বক অঙ্গন প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

ঘণ্টা-দুই আমরা নৃত্যাদি দেখিয়া কাটাইলাম। প্রথমে মন্দ লাগে নাই, কিন্তু অবশেষে বিরক্তি ধরিয়া গেল, কেন-না নৃত্য বাদ্য এবং যুদ্ধাভিনয়, সমস্তই একঘেয়ে। মেয়েদের ধৈর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। রৌদ্রের তাপে সুন্দরীদের সুগৌর মুখগুলি

রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কপালে মুক্তাসদৃশ বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে; কিন্তু তাহাতে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। সেই যে ঘণ্টা-দুই আগে কনে-বৌদের মত পা টিপিয়া টিপিয়া তাহারা নৃত্য (?) সুরু করিয়াছে, থামিবার তো কোনো লক্ষণই দেখিতেছি না; আমরা কিন্তু সেখানে আর দেরি না করিয়া শিলঙের পথ ধরিলাম।

প্রতি বৎসর যে মাসে 'স্মিটে' খাসিয়াদের 'পম-ব্লাং' উৎসব এবং তদুপলক্ষে কুমারীদের নৃত্য হয়। নংক্রেমের 'সিম' এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা বলিয়া ইহা 'নংক্রেমের পূজা' নামে পরিচিত। শস্যাদির উন্নতি এবং রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য 'কা-ব্লেই-সংসার' অর্থাৎ জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট ছাগবলি দেওয়া হয়, সময়মত পৌঁছিতে না পারায় আমরা 'পম-ব্লাং' উৎসব দেখিতে পারি নাই।

জোয়াই শিলং হইতে তেত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া ছাড়া সেখানে পৌঁছিবার আর অন্য উপায় নাই। আমি এক দিন সকালবেলা, স্বামীজীর ব্যবস্থামত দুই জন খাসিয়া ডাকওয়ালার সঙ্গে জোয়াই রওনা হইলাম। প্রায় সতেরো মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া আমরা 'মউ রং-খ্রেং-এর ডাকবাংলাতে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে শিলঙের ডাকওয়ালারা দুইজন সিণ্টেং ডাকওয়ালার জিম্মায় ডাক এবং আমাকে সঁপিয়া দিয়া বিদায় হইল। ডাক ঘাড়ে করিয়াই সিণ্টেং দুইজনে প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল। পাছে জঙ্গলের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলি তাই তাহাদের পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিলাম। পথের দৃশ্য বিচিত্র— কোথাও দীর্ঘপত্রসমন্বিত পাইন-শ্রেণী, কোথাও বা দিগন্তবিসর্পিত বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রান্তর, কোথাও বা বিরাট বনস্পতি-সমূহে পরিপূর্ণ সুদূরপ্রসারিত নিবিড় অরণ্যানী। এই আরণ্য শোভা

উপভোগ করিবার মত অবস্থা কিন্তু তখন আমার নয়। প্রকাণ্ড এক বোঁচ্‌কা ঘাড়ে করিয়া এক রকম মরীয়া হইয়াই ছুটিতেছি। মনে হইতেছে, যেন আমাদের তিন জনের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে কালো পোষাক-পরা এক দল সিণ্টেং রমণীর একেবারে সাম্‌নাসাম্‌নি আসিয়া পড়িলাম। অম্‌নি একসঙ্গে প্রায় দশ জোড়া (কালো নয়) কটা চোখের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি আমার উপরে নিক্ষিপ্ত হইল এবং পরক্ষণেই সম্মিলিত নারীকণ্ঠের অট্টহাস্যে নিস্তব্ধ বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। আমার ধারণা ছিল যে, আমার তৎকালীন অবস্থাটা স্নেহ-সুকোমল নারীহৃদয়ে যদি কোনো রসের উদ্রেক করিতে পারে তো তাহা করুণ রস। কিন্তু সিণ্টেঙ্গিনীরা আমার সে-ধারণা বদলাইয়া দিল। যাই হোক পুরুষ-বাচ্চার ইহাতে ঘাবড়াইলে চলে না। আমিও বিড়ালাক্ষীদের বিদ্রূপ-হাস্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মরি-বাঁচি করিয়া দৌড়াইতে লাগিলাম এবং সন্ধ্যার একটু পরে আধমরা অবস্থায় সিণ্টেংদের দেশ জোয়াইয়ে আসিয়া পৌঁছিলাম।

পরদিন বিকালে শহরে বেড়াইতে বাহির হইলাম। দৃশ্য-সৌন্দর্য্যে জোয়াই অতুলনীয়। এখানকার মত অমন সুন্দর পাইন-কুঞ্জ খাসিয়া পাহাড়ের কোথাও নাই। শিলঙের চেয়ে এ-জায়গা ঢের নির্জ্জন ও নিরালা। যাহারা শিলঙে বেড়াইতে যান, তাঁহারা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া (অবশ্য সিণ্টেং ডাকওয়ালার সঙ্গে নয়) জোয়াইয়ে গেলে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন।

শহরের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকেরাই জিনিষপত্র বিকিকিনি করিতেছে, চায়ের দোকান অনেকগুলি। সিণ্টেং-দ্রৌপদীরা বাজারেই রন্ধন করিয়া উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত এক প্রকার ব্যঞ্জন বিক্রী করিতেছে। বাজারে শুক্‌নো মাছ,

কুক্কুট, শূকর-মাংস ইত্যাদির আমদানীই বেশী। বেঙের ছাতা, বোল্‌তার চাক ইত্যাদিও দেখিলাম ; ওগুলা নাকি সিণ্টেংদের প্রিয় খাদ্য।

আমি জোয়াইয়ে আসিবার কিছুদিন পরেই সেখানে 'বে-ডিং-খ্লাম' উৎসব পড়িয়া গেল, ইহা সিণ্টেংদের সর্ব্বপ্রধান উৎসব। প্রতি বৎসর জুন মাসে জোয়াইয়ে এবং জৈন্তা পাহাড়ের আরও নানা স্থানে উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'বে-ডিং-খ্লাম' কথাটার মানে লাঠিদ্বারা মহামারী তাড়ানো।

জোয়াই শহরের প্রত্যেক পল্লীতে এক একটি 'কা-ইং-পূজা' অর্থাৎ পূজাঘর আছে। জুন মাসের ষোল-সতেরো তারিখ হইতে শহর এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের ছেলেবুড়া সকলে ভিন্ন ভিন্ন 'কা-ইং-পূজা'তে সমবেত হইয়া কাজ-কর্ম্মে রত হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমোদ-উৎসবও পুরাদমে চলিতে লাগিল। প্রথম কয়দিন তাদের কাজ রং-বেরঙের কাগজ দিয়া রথ তৈরি করা। তারপর একদিন সকালে সকলে প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করিয়া 'হয়' 'হয়' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক হাততালি দিয়া বিবিধ অঙ্গভঙ্গীসহকারে উদ্দাম নৃত্য করিতে করিতে গোটা শহরখানা প্রদক্ষিণ করিল। সেদিন জঙ্গলের ভিতর হইতে কতকগুলি গাছ কাটিয়া আনা হইল এবং লোকেরা নিজেদের বাড়ীর উঠানের মধ্যে এক একটি গাছ পুঁতিয়া রাখিল। সিণ্টেংদের বাড়িতে গিয়া দেখিতে পাইলাম, পুরুষেরা এক একটি লাঠিদ্বারা ঘরের চালে আঘাত করিতেছে এবং মহামারীর ভূতকে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিতেছে।

বিকালবেলা সকলে কাগজের তৈরি সং, বেলুন ইত্যাদি সহ এক খোলা ময়দানে জমায়েৎ হইয়া আবার নৃত্য আরম্ভ করিল। মেয়েরা উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া নাচ দেখিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নৃত্য শেষ হইলে কাগজের তৈরি রথগুলাকে 'কা-ইং-

পূজা-সমূহ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া শহর হইতে কিছুদূরে একটি জলার নিকটে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে একহাঁটু জলের মধ্যে সকলে আবার নৃত্য সুরু করিল। জলার কাছে স্ত্রী-পুরুষের যেন মেলা জমিয়া গেল। জননীরা দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে কাপড় দিয়া পিঠে বাঁধিয়া সেখানে হাজির হইল।

জলমধ্যে কিছুক্ষণ নৃত্য হইবার পর একদল লোক সত্বকর্ত্তিত একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষকে বহন করিয়া লইয়া আসিল। ঐ বৃক্ষটি 'উ-ব্লেই' অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতীক। বৃক্ষটিকে জলে স্থাপিত করিবার পর দলে দলে লোকেরা তাহাতে চড়িয়া বসিল, তারপর এই গাছটি দখল করিবার জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে লড়াই আরম্ভ হইল। সিণ্টেংদের বিশ্বাস, যে-দল গাছটি দখল করিতে পারিবে, সেই দলের লোকেরা আগামী বৎসর স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধিলাভ করিবে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে কাগজের তৈরি রথসমূহ এবং বৃক্ষটিকে জলাগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া যে-যার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

'বে-ডিং-খ্লাম' উৎসবের দিনকতক পরে একদিন বিকালে রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখি, বাঁশের চাটাই দিয়া ঢাকা একটি শব-দেহকে কয়েকজন সিণ্টেং দাহ করিবার নিমিত্ত বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। বহু স্ত্রী-পুরুষ পান-সুপারি, অন্নব্যঞ্জন ইত্যাদি সহ শবের অনুগমন করিতেছে। আমি তাহাদের পিছনে পিছনে সৎকার-ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ছোট একটি টিলার উপর চিতা রচনা করা হইল। স্ত্রী-পুরুষ সকলে চিতার উপর পান-সুপারি সিকি-দুয়ানি ইত্যাদি রাখিল। চিতায় আগুন দিবামাত্র মৃতব্যক্তির মাতুল একটি কুক্কুটের গলা কাটিয়া অগ্নিতে কিছু রক্ত নিক্ষেপ করিল। তারপর, কুক্কুটটিকে আগুনে সেঁকিয়া টুক্রা টুক্রা করিয়া কাটিয়া একটা বংশখণ্ডে গাঁথিয়া রাখা হইল।

মৃতদেহ ভস্মীভূত হইবার পর আগুন নিবাইয়া অস্থিগুলি এবং সিকি-দুয়ানি ইত্যাদি কুড়াইয়া লওয়া হইল।

এক বৃদ্ধা অস্থিগুলি হাতে লইয়া বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র আওড়াইলে সকলে আবার ও-গুলার উপরে পান-সুপারি রাখিল। অতঃপর সকলে একটি প্রস্তর-স্তম্ভের নিকটে গমন করিল। একটি গাছের পাতা মাটিতে বিছাইয়া তাহাতে কদলী, আম্র, পিষ্টক ইত্যাদি রাখা হইল এবং পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধাটি মন্ত্র আওড়াইয়া মাটিতে কিয়ৎপরিমাণ মদ ঢালিয়া দিল। সৎকার-সংক্রান্ত এই সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে পর, মৃতের মাতুল অস্থিগুলি ভূমিতে পাতিত একখানা সমতল শিলাখণ্ডের নীচে রাখিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, দিনকতক পরে উক্ত প্রস্তরখণ্ডের নীচে হইতে মৃতের অস্থি স্থানান্তরিত করিয়া তদুপরি একটি খাড়া প্রস্তরস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। এগুলিকে বলে 'কা জিং-কন-মাউ'। জোয়াই শহরে রাস্তার ধারে এখানে-সেখানে বহু 'কা-জিং-কন-মাউ' দেখিতে পাওয়া যায়।

জোয়াই শহরস্থ সিণ্টেংদের বাড়িগুলা বিলাতী ফ্যাশানে তৈরি। প্রত্যেক বাড়িতেই ছাদের উপর একটি করিয়া চিম্‌নি আছে। সিণ্টেংদের মধ্যে অনেক ওস্তাদ মিস্ত্রী আছে, তাহারাই এ সমস্ত বাড়ি তৈয়ার করিয়া থাকে। গ্রামবাসীদের বাড়ীগুলি কিন্তু আলাদা ধরণের, সেগুলির ছাদ ডিম্বাকৃতি, ঘরে জানালা থাকে না। সিংণ্টেংরা তাহাদের ঘরের সাম্‌নের খানিকটা জায়গা লাল মাটি কিংবা গোবর দিয়া লেপিয়া রাখে।

খ্রীষ্টান সিণ্টেংরা কোট-প্যাণ্ট, ওয়েষ্টকোট ইত্যাদি পরিধান করে। শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসীদের সঙ্গে যাহারা কাজ-কারবার করে তাহারা ধুতি ও জামা পরে। পাগড়ী প্রায় সকলেই মাথায় বাঁধিয়া থাকে, কাহারও কাহারও মাথায় কালো রঙের কাপড়ে তৈরি একরকম টুপী দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রাম্য সিণ্টেংরা একরকম হাতা-ছাড়া কোর্ত্তা ব্যবহার করে।

স্ত্রীলোকেরা আপাদলম্বিত সেমিজের উপর ছোট একটি জামা গায়ে দেয়, একটি চার-পাঁচ হাত লম্বা কাপড় কোমরে গেরো দিয়া পরে ও একটি

বন-পথে সিণ্টেং রমণী

চাদর দিয়া সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখে। মস্তকে তাহারা আলাদা একটি বস্ত্রখণ্ড অবগুণ্ঠনরূপে ব্যবহার করে। এরূপভাবে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত

করিয়া পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আসামের অন্যান্য পাহাড়ী রমণীদের দেখি নাই। সাধারণতঃ মস্তক এবং বক্ষদেশের উপরিভাগ অনাবৃত রাখাই অন্যান্য পার্ব্বত্য স্ত্রীলোকদের রেওয়াজ। কেবলমাত্র লুসাই নারীরা সেমিজ গায়ে দেয়। সিণ্টেং রমণীদের পোশাক সাধারণতঃ কালো রঙের, তাহাদের বস্ত্রাভ্যন্তরে সকল সময়েই পান-সুপারিতে ভরা ছোট একটি কাপড়ের থলি থাকে।

প্রবাল এবং সোনায় তৈরি ফাঁপা কণ্ঠহার সিণ্টেং নারীদের প্রিয় অলঙ্কার। ইহারা কানে মাকড়ি, হাতে চুড়ি, গলায় রূপার চেন পরে, চেনগুলি গলা হইতে কোমর পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে।

ভাত, শুক্‌নো মাছ এবং শূকর ও কুক্কুট-মাংস সিণ্টেংদের প্রধান খাদ্য। একমাত্র গোমাংস ছাড়া আর সকল প্রকার মাংসেই ইহাদের অত্যন্ত আসক্তি আছে। ইহারা অতি প্রত্যূষে এবং বিকালে—দিবসের মধ্যে দুইবার খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রত্যূষে জোয়াইয়ের রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলে দগ্ধ শূকরের দুর্গন্ধে নাড়ীভুঁড়ি উল্টিয়া আসিতে চায়। ইঁদুর ব্যাঙাচি প্রভৃতিও ইহাদের বিশেষ প্রিয় খাদ্য। ইহারা পচা ভাত হইতে প্রস্তুত মদ্য পান করে। সিণ্টেংদের প্রধান প্রধান পূজা এবং উৎসবাদিতে মদ্য একটি অত্যাবশ্যক জিনিষ।

ইহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ঢের বেশী। সেজন্য পাত্র জুটাইতে মেয়ের বাপকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। তাই সাধারণতঃ অধিক বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয়। আমি নিমন্ত্রিত হইয়া সিণ্টেংদের একটি বিবাহ-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলাম। পাত্রীটির বয়স ছিল কমপক্ষে ছাব্বিশের কাছাকাছি। বিবাহ কনের বাপের বাড়ীতে হয়। বিবাহের পর কনে স্বামীর ঘরে যায় না, বাপের বাড়ীতেই থাকে। দিবাভাগে স্বামী-স্ত্রীর দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া নিষিদ্ধ। সন্ধ্যার পর স্বামী মহাশয়েরা শ্বশুর-

বাড়িতে গিয়া নিজ নিজ পত্নীর সহিত রাত্রিযাপন করেন এবং রাত্রি প্রভাত হইবার আগেই নিজেদের বাটীতে ফিরিয়া আসেন। শ্বশুরালয়ের খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করিবার অধিকার তাহাদের নাই। আজকাল খ্রীষ্টান সিণ্টেংরা অনেকেই কিন্তু, এ প্রথা মানিয়া চলে না। সিণ্টেংদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু কোনো নারী স্বামীর মৃত্যুর পর যদি আর বিবাহ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তাহা হইলে সে মৃত স্বামীর অস্থি নিজের কাছে রাখিতে পারে।

ইহারা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা খুব বেশী পান খায়। কেহ বাড়ীতে বেড়াইতে আসিলে সিণ্টেং-গৃহিণী প্রথমেই পান-সুপারি দিয়া অভ্যর্থনা করে। ইহারা ঘরে বাহিরে যেখানেই থাকুক না কেন, পান-সুপারি সঙ্গে থাকিবেই। ইহাদের বিশ্বাস মানুষ মৃত্যুর পর সুপারি-গাছে পরিপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে বাস করিয়া অবাধে পান-সুপারি খাইতে থাকে। মৃত ব্যক্তির প্রসঙ্গে তাহারা সময় সময় "উবা বাম কোয়াই হা ইং উ-ব্লেই"—অর্থাৎ "সেই ব্যক্তি যিনি ভগবানের গৃহে পান-সুপারি খাইতেছেন"—এই কথা কয়টি বলিয়া থাকে।

ইহারা অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, নোংরা। সপ্তাহে একদিনও স্নান করে কি না সন্দেহ। কাছে আসিলে গায়ের দুর্গন্ধে তিষ্ঠানো দায় হইয়া উঠে। দৈহিক শুচিতা রক্ষা সম্বন্ধে ইহারা অত্যন্ত উদাসীন।

সিণ্টেংদের প্রধানকে বলে দলৈ। জনসাধারণ দলৈ নির্ব্বাচিত করে। ছোটখাটো কতকগুলি সামাজিক অপরাধের বিচারের ভার দলৈয়ের হাতে ন্যস্ত আছে। তাহার সহকারীগণ পাত্র, বাসন সাঙ্গত প্রভৃতি নামে পরিচিত।

সিণ্টেং রমণীরা সদা প্রফুল্লচিত্ত, হাসিখুশী ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। প্রায় সকলেরই গায়ের রং খুব ফরসা,

দেহের গড়ন নিটোল এবং সুডৌল, কেহ কেহ অনবদ্য রূপলাবণ্যসম্পন্না।

সিন্টেং পুরুষ—ইহারা খ্রীষ্টান

স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় পিতামাতার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা। অন্য মেয়েরাও কিছু অংশ পাইয়া থাকে, কিন্তু

ছেলেদের ভাগ্যে কানাকড়িটিও জোটে না। ইহাদের অভাব-বোধ তেমন প্রবল নহে। জীবিকার জন্য দরিদ্রতম সিণ্টেংও ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করে না। এই পার্ব্বত্য জাতির নিকট আমাদের যতগুলি শিক্ষণীয় বিষয় আছে, তন্মধ্যে ইহা একটি।

সিণ্টেংরা অত্যন্ত সরল ও বিশ্বাসী। ইহারা প্রকৃতির সন্তান। সারাদিন পাহাড়-জঙ্গলের ভিতরে প্রকৃতির স্নেহ-ক্রোড়ে থাকিতেই ভালবাসে। প্রাচীনকালে শ্রীহট্টের অন্তর্গত জৈন্তাপুরে ছিল স্বাধীন সিণ্টেং রাজাদের রাজধানী, তাঁহারাই স্বজাতি সিণ্টেংদের অধ্যুষিত পাহাড়টিকে জৈন্তা পাহাড় নামে আখ্যায়িত করেন। তখনকার দিনে ইহারা হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকিতে পারে নাই। গেট সাহেব তাঁহার আসামের ইতিহাসে সিণ্টেং রাজাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"রাজপরিবার ও বিশিষ্ট অভিজাত-বংশীয়েরা অংশতঃ হিন্দু-ধর্ম্মের আওতায় আসেন। রাজারা শাক্ত ছিলেন।"

সিণ্টং নৃপতিরা এবং তাঁহাদের অমাত্যবর্গ বহু হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান স্বজাতির মধ্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আজও পর্য্যন্ত সিণ্টেংদের আচার-ব্যবহার এবং রীতি-নীতিতে হিন্দু প্রভাবের বহু ছাপ রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় একদিন যাহারা আংশিক ভাবে আমাদের বৃহত্তর হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, খ্রীষ্টান মিশনারীদের দীর্ঘকালব্যাপী প্রচার-কার্য্যের ফলে আজ তাহারা আমাদের নিকট হইতে একেবারে বিছিন্ন হইয়া গিয়াছে, আমাদের পরস্পরের ভিতরকার যোগসূত্র আজ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

অভ্রখনির সন্ধানে

সিণ্টেংদের দেশে দীর্ঘকাল কাটাইয়া, সিলেটে ফিরিয়া নিশ্চিন্ত আরামে দিন গুজরাণ করিতেছিলাম, হঠাৎ খাসিয়া পাহাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উর্দ্ধে পাড়ু নামক স্থানে এক অভ্রের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে এখবর শুনিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। অভ্রখনির অজানা রহস্যের সন্ধানে দুর্গম দুরারোহ পার্ব্বত্য পথে পদব্রজে ভ্রমণের নেশা আবার আমাকে আকুল করিয়া তুলিল। আমাদের এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাতে মেজদা আর অনুচর অমরদাস সহ ডাউকিগামী মোটরে চাপিয়া বসিলাম। খোঁজ-খবর লইয়া জানিলাম যে, পাড়ু পৌঁছিতে হইলে ডাউকি হইতেই আমাদিগকে গিরি-অভিযান সুরু করিতে হইবে।

বেলা আন্দাজ দশটা নাগাদ জৈন্তাপুরে নামিয়া স্থানীয় ডাক-বাংলায় আশ্রয় লওয়া গেল। এই জৈন্তাপুরই নাকি মহাভারতে বর্ণিত সেই বিশাল নারীরাজ্য যেখানকার অধীশ্বরী বীরাঙ্গনা প্রমীলা মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে যথেষ্ট বীরপনা দেখাইয়াছিলেন। সেই সুদূর অতীতকাল হইতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এখানে হিন্দু-রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতকে জনৈক পার্ব্বত্য নৃপতি জৈন্তাপুরে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি পর্ব্বত রায় এই হিন্দু নাম গ্রহণ করেন। কালক্রমে, রাজপরিবারের লোকেরা নিজস্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং রাজা বড় গোঁসাঞির আমলে বাম-জঙ্ঘা মহাপীঠ আবিষ্কৃত হইলে পর জৈন্তাপুর তান্ত্রিকতার

লীলা-নিকেতনে পরিণত হয়। জয়ন্তেশ্বরীর মন্দিরের সামনে এখনো একটি শান-বাধানো সুপ্রশস্ত বেদী বিদ্যমান, সিণ্টেং রাজাদের আমলে যেখানে নরবলি দেওয়া হইত। মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে খোদাই-করা মূর্ত্তিগুলি হইতে সে-কালের জৈন্তাপুরবাসীদের ভাস্কর্য্য-শিল্পে নৈপুণ্যের

জৈন্তাপুরের প্রাচীন শিব-মন্দির

কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। দেওয়ালের ডানদিকে খোদিত আছে—একটি অশ্বারূঢ়া নারীমূর্ত্তি, তাহার বাম হস্তে বল্গা ধৃত আর দক্ষিণ হস্ত বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীসহকারে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত। বা-দিককার মূর্ত্তি-গুলার মধ্যে বিশেষ ভাবে নজরে পড়ে একটি উপদ্রুত হস্তীর মূর্ত্তি। হাতীটি আষ্টে-পৃষ্ঠে শিকল দিয়া বাঁধা, অবনতদেহা এক নারী হাতীর পেছনের দুই পায়ের বন্ধন-শৃঙ্খল এবং লাঙ্গুলটি দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরিয়া রাখিয়াছে আর তাহার পশ্চাদভাগ হইতে তেজোদৃপ্তা

বিক্রমশালিনী দুইটি নারী সুদীর্ঘ বর্শাদ্বারা হাতীটাকে খোঁচা মারিতেছে। এই মূর্ত্তিগুলা কি ইহাই সূচিত করেনা যে, প্রমীলার রাজ্যে একদা এমনিতর বীর্য্যশালিনী বীরাঙ্গনাদের অপ্রতুল ছিল না।

"পান পানি নারী, তিনে জৈন্তাপুরী"—এই একটি বহুপ্রচলিত ছড়া ছোটবেলা হইতে সিলেটে শুনিয়া আসিতেছি। সারি নদীতে স্নান করিতে গিয়া নারীর সৌন্দর্য্য আর জলের নৈর্ম্মল্যের জন্য জৈন্তাপুরের প্রসিদ্ধি যে অমূলক নয়, তাহা বুঝিতে পারা গেল। কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ অনতি-গভীর নদীজলে সুকুমারকান্তি যুবতী পাহাড়ী মেয়েরা ছুটোপাটি সুরু করিয়া দিয়াছে। কটিতে তাদের ছোট একটিমাত্র বস্ত্রখণ্ড জড়ানো, বক্ষদেশ সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের রজত-ধারা, মসৃণ প্রস্তরবাহী গিরি-নির্ঝরিণীর মত তাহাদের অসংবৃত নিটোল গাত্র বাহিয়া নদীজলে গড়াইয়া পড়িতেছে। প্রকৃতির স্নেহ-ক্রোড়ে প্রতিপালিতা এই সমস্ত পাহাড়ী মেয়েরা যেন এই মৃদু কল্লোলিত নদীটির নর্ম্ম-সহচরী।

স্নানাহারান্তে আমি একলাই রওনা হইলাম আসামের অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য রূপনাথ গুহার উদ্দেশ্যে।

কাঁচা রাস্তা ধরিয়া মাইল দুই চলিয়া অবশেষে পাহাড়ে ঢুকিয়া জনবিরল বন-পথ দিয়া একাকী অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথের উভয় পার্শ্বে নয়নস্নিগ্ধকর বনভূমির শ্যামলিমা। বেলা তিনটা নাগাদ 'সাওাই পুঞ্জি'তে পৌছিলে পর একটি পাহাড়ী আমাকে 'মামা' সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া, "টুমার কৈ যাই" বলিয়া আমার গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। এই নবলব্ধ ভাগিনেয়টির পিতৃশ্যালক-পদে অভিষিক্ত হইয়া গৌরব বোধ করিলাম না বটে, কিন্তু সে

আমাকে সঙ্গে করিয়া রূপনাথ গুহায় লইয়া যাইতে রাজী হওয়ায় আশ্বস্ত হইলাম; বুঝিলাম ইনি ব্যবসা ব্যপদেশে জৈন্তাপুর পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়া থাকেন, মধুর "মামা" ডাকটি সেখান থেকে আমদানী করা, এবং জৈন্তাপুরের নীচশ্রেণীয় ব্যবসায়ীদের সহিত দহরম-মহরমের ফলেই বঙ্গভাষায় এতাদৃশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন!

রূপনাথের পথে তরু-বীথিকা

আন্দাজ পোয়া মাইল যাইবার পর বাঁ-দিকে এক দুষ্প্রবেশ্য জঙ্গলের ভিতরকার নিরতিশয় সঙ্কীর্ণ, গলিত পত্রে সমাচ্ছন্ন এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়া কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া গুহামুখে পৌঁছিয়া ভিতরের পানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। গুহাভ্যন্তরস্থ নিবিড় অন্ধকারের অজানা রহস্য যেন যাদুমন্ত্রবলে আমার সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমার পথপ্রদর্শক তাহার হস্তস্থিত মশালটি জ্বালাইয়া লইলে পর

আমরা উভয়ে সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিয়া বায়ুহীন নিস্তব্ধ নীরন্ধ্র অন্ধকারাবৃত গুহামধ্যে প্রবেশ করিলাম। মশালের ক্ষীণ আলোয় স্বল্পালোকিত, দর্পণের মত স্বচ্ছ, ঝক্‌ঝকে গুহা-ছাদটির নৈসর্গিক কারুকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। কোন্ সুনিপুণ রূপকার যেন বহুযত্নে পাথর কুঁদিয়া ছাদটিকে অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। গুহামধ্যে বহুসংখ্যক মেটে রঙের মসৃণ সুদৃঢ় বিরাট্ পাষাণ-স্তম্ভ সারবন্দীভাবে অবস্থিত। গুহাটি আয়তনে বিশাল। এ যেন পাতাল-পুরীর এক পরম রমণীয় বিরাট্ প্রাসাদ, ইহারই কোনো এক মণিদীপপ্রদীপ্ত নিভৃত রহস্য-কক্ষে মর্ম্মরপ্রস্তররচিত পালঙ্কে শয়ান প্রিয়প্রতীক্ষমানা পাতালপুরীর রাজকন্যার দর্শনলাভ আচম্‌কা অদৃষ্টে ঘটিয়া যাওয়া বোধ করি, মোটেই বিচিত্র নহে। এক জায়গায় পাশাপাশি স্থিত পাঁচটি প্রকাণ্ড প্রস্তর-স্তম্ভকে খাসিয়াটি যুধিষ্ঠির ভীম প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডবের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। জৈন্তা পাহাড়ে হিন্দুতীর্থের বিদ্যমানতা হেতু এখানকার অধিবাসী অনার্য্যরাও যে হিন্দু-সংস্কৃতি দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম। উপল-বিষম বন্ধুর পথ বাহিয়া ক্রমাবরোহণ করিতে করিতে অবশেষে পদতলে আর্দ্র মৃত্তিকার স্পর্শ অনুভব করিলাম। গুহাপ্রাচীরসংলগ্ন এক জায়গায় ভূগর্ভ হইতে অনবরত জল উঠিতেছে। এখান হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে করিতে আর একটি গুহা-প্রকোষ্ঠের সম্মুখে আসিয়া পৌছিলাম। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডসমূহ প্রবেশ-পথকে এতদূর সঙ্কীর্ণ এবং দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে যে ভিতরে ঢোকাই মুশকিল। পিচ্ছিল প্রস্তরখণ্ডগুলির উপর দিয়া হামাগুড়ি দিয়া বহু আয়াসে ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখি, মাথার উপর নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারে অজস্র মণিমুক্তা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে—যেন মসীবরণ আকাশে

অগণিত তারকারাজি দীপ্যমান। অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কবে না জানি কাহারা এই গুহা-প্রকোষ্ঠের ছাদটিকে মণি-মুক্তায় খচিত করিয়াছিল! কিন্তু নাতিউচ্চ ছাদ স্পর্শ করিবামাত্র যখন আমার আঙুলের ডগা ভিজিয়া উঠিল তখন আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। ভালোরূপে পরখ করিয়া দেখি উপরকার প্রস্তরচ্ছদ

ভুবনছড়ার উপরে জৈন্তাপুরের খাসিয়া রাজাদের আমলে নির্মিত পাথরের সেতু

হইতে বাহির-হওয়া অগণিত ছোট ছোট ফ্যাক্[illegible]লিতে পাহাড়-চুয়ানো জলকণা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে এবং মশালের আলোয় দ্যুতিমান্

হইয়া সেগুলা মণিমাণিক্যের বিভ্রম জন্মাইতেছে। এই স্থান হইতে মশালচী আমাকে নিবিড়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; নিরতিশয় সঙ্কীর্ণ এক গহ্বরের ভিতর দিয়া লইয়া চলিল। তাহার পিছনে পিছনে টিপি-টিপি চলিয়াছি ত চলিয়াইছি—এ চলার যেন শেষ নাই। এদিকে মশালচীর হস্তস্থিত নিঃশেষিত-তৈল মশালটিও প্রায় নিব-নিব হইয়া আসিয়াছে। চারিদিক শুধু জমাট-বাঁধা অন্ধকার আর অন্ধকার। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া দৃষ্টি চলে না। পাতালপুরীর নানা বিচিত্র দৃশ্য দর্শনজনিত বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়া এবার নিদারুণ আতঙ্কে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; আলো যদি দৈবাৎ নিবিয়া যায়, তাহা হইলে সূর্য্যালোকিত পৃথিবী-পৃষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা আর অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিবে না। চকিতে রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' গল্পের কথা মনে পড়িল। এই অনন্ত তিমির-গর্ভে জীবন্ত সমাধির ভয়াবহতা কল্পনা করিয়া আমার যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল, ভীতি-কম্পিত কণ্ঠে মশালচীকে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িবার জন্য অনুরোধ করিলাম। আমার কণ্ঠস্বর হইতে আমার অবস্থাটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াই বুঝি সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অন্ধকার গহ্বরের নৈঃশব্দ্য ভগ্ন-করা সেই প্রচণ্ড অট্টহাস্য শুনিয়া বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ যমদূত সত্য-সত্যই অবশেষে আমাকে মৃত্যুপুরীতে লইয়া আসিয়াছে! খানিকক্ষণ পরে সুমুখের পানে প্রায় দুইশত গজ ব্যবধানে বহু উর্দ্ধে মৃদু আলোকিত একটি সঙ্কীর্ণ ছিদ্র-পথ দৃষ্টিগোচর হইল,—কি স্নিগ্ধ, অপূর্ব্বমনোহর এই শুভ্র আলোর রেখা! ছিদ্র-পথটির নাম নাকি স্বর্গদ্বার। বাস্তবিকই যেন স্বর্গ হইতে বিচ্ছুরিত শুভ্র অমলিন জ্যোতি-কণা গুহা-রন্ধ্র-পথকে দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। আলো যে কত সুন্দর, মরলোকে বিধাতার দেওয়া এ যে

কি অপূর্ব্ব অমৃত তা এই পাতাল-পুরীতে না আসিলে বোধ করি এমন ভাবে সমস্ত সত্তা দিয়া উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য আমার এ জীবনে হইত না। ভাবিয়াছিলাম স্বর্গদ্বার দিয়াই এই পাতাল-পুরী হইতে মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, কিন্তু আমার পথ-প্রদর্শক আমাকে
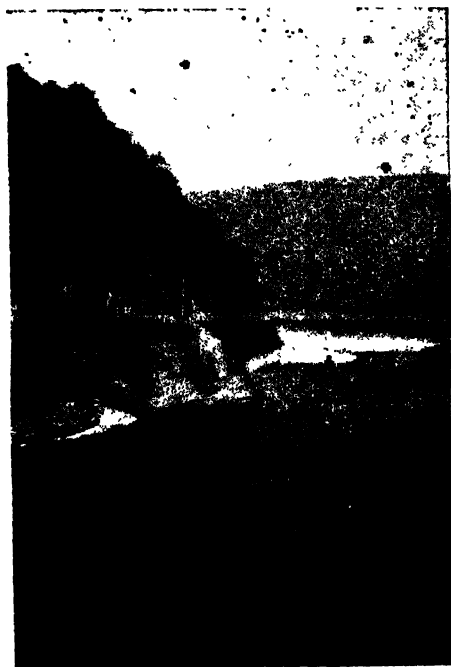
ডাউকি নদীর উপরে ঝুলানো সেতু

ভিন্ন পথে লইয়া চলিল। একটু বাদেই যে-পথে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলাম তাহা নজরে পড়িল। ঘন সন্নিবিষ্ট তরুরাজির পত্রাবরণ ভেদ করিয়া এক ফালি রোদ গুহামুখে পড়িয়া চিক্‌চিক্ করিতেছে।

পাতাল-গহ্বর হইতে বাহিরে আসিয়া পৃথিবীর আলো-বাতাসের স্পর্শ যে কি মধুর লাগিল, তাহা আর বলিবার নয়। রূপনাথ গুহার অনতিদূরে এক ঝরি-নামা বটগাছের নীচে ভগ্ন জীর্ণ দেবতাহীন শূন্য মন্দিরটি অবস্থিত। রূপনাথ এই মন্দিরের উপর বিরূপ হইয়া পর্ণ-কুটীরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। প্রতি বৎসর খাসিয়ানীরা নাকি বন্য লতা-পাতা দিয়া ভোলানাথের কুটীরখানা ছাইয়া দেয়।

মন্দির দর্শন করাইয়া বখশিস্ লইয়া পাহাড়ীটি চলিয়া গেল। আমিও জৈন্তাপুরের পথে রওনা হইলাম। ডাকবাংলায় যখন পৌছিলাম তখন রাত আন্দাজ নয়টা। পরদিন বেলা দুইটা নাগাদ মোটরযোগে ডাউকিতে পৌছানো গেল, এখান থেকেই আমাদিগকে গিরি অভিযান সুরু করিতে হইবে। পথের সন্ধান জানা নাই; খাসিয়াদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা ডান দিকে একটা চড়াই দেখাইয়া দিয়া বলিল যে, ঐ রাস্তা ধরিয়া বরাবর চলিয়া গেলে সথাপুঞ্জীতে পৌছানো যাইবে। সেখানে এক জন 'পস্তর' (খাসিয়া পাদরী) আছেন। তাঁহার নিকটেই নাকি অভ্রখনি সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে পারা যাইবে। সুতরাং খাসিয়াদের নির্দ্দেশিত পথেই রওনা হওয়া গেল।

দলে দলে বিচিত্র পোশাক পরা খাসিয়ানীরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বোঝা পিঠে লইয়া হাস্যে গল্পে নিস্তব্ধ পার্ব্বত্য পথ মুখরিত করিয়া চলিয়াছে ডাউকির হাটে বেসাতি করিতে। চলিতে চলিতে যখনই গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠে, তখনই কোনও খাসিয়ানীর নিকটে গিয়া বলি, "আই ইয়াঙ্গি তম্পেউ বাড কোয়াই খণ্ডিয়াং" (আমাদিগকে কিছু পান-সুপারি দাও।)

খাসিয়ানী পিঠের বোঝা হইতে পান আর কোমরে ঝুলানো ঝোলাটি হইতে আস্ত আস্ত কাঁচা সুপারি বাহির করিয়া হাসির ঝরণা ঝরাইয়া বলে, "সিম নো, বাম" (ধর, খাও)। চড়াইটির শীর্ষদেশে পৌঁছিয়া একটি শিলাপট্টের উপর বসিয়া পড়িলাম। এইটি এত বিশাল যে, পাঁচ-ছয় জন ইহার উপর শুইয়া পড়িলেও স্থানের অকুলান হইবে না। নিম্নাভিমুখে তাকাইবামাত্র বিচিত্র এবং অভিনব দৃশ্যপট চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল। চক্রবাল পর্য্যন্ত প্রসারিত সমতলভূমিতে কোথাও হরিদ্বর্ণ সুবিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত, কোথাও শষ্পাবৃত প্রান্তর; আবার কোথাও বা শ্যামায়মান বনভূমির অনন্ত প্রসার। স্থানে স্থানে আঁকাবাঁকা নদী-খাল-বিলের জলরেখা প্রখরোজ্জ্বল রৌদ্রকরে রূপার পাতের মত চক্‌চক্‌ করিতেছে। কাননকুন্তলা বসুমতীর শ্যামল অঙ্গ যেন রজত আভরণে বিভূষিত।

প্রাণ ভরিয়া বহুক্ষণ সমতলের দৃশ্য উপভোগ করিয়া পুনরায় আমরা পথ চলিতে লাগিলাম। খানিক দূর যাইবার পর পিছনে বামাকণ্ঠে 'মামা' ডাক শুনিয়া থামিতে হইল। একটু পরে এক খাসিয়া যুবতী ত্বরিতপদে আসিয়া আমাদের সঙ্গ ধরিল। খাসিয়া ভাষাটা অল্পস্বল্প জানা থাকায় মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জমিয়া উঠিল। সে গল্প করিতে করিতে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া চলিল। জন-মানবশূন্য ছায়াবন অরণ্যে এই হাস্যময়ী তরুণীর আকস্মিক অভ্যাগম আমার নিকট যেন পরম রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। এই রহস্যময়ীর নির্দ্দেশেই যেন কোন্ অনাবিষ্কৃত স্থানে প্রকৃতির গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করিতে দুর্জ্ঞেয় পথে আমাদের এই অভিযান। মনে পড়িল লংফেলোর কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি :—

"Come wander with me," she said

"Into the regions yet untrod
And read what is still unread
In the manuscripts of God"

অরণ্যে প্রদোষান্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন ডান দিকের একটি সুঁড়িপথ ধরিয়া বরাবর সথাপুঞ্জীতে চলিয়া যাইবার পরামর্শ আমাদিগকে দিয়া এই ভয়লেশহীনা নিঃসঙ্গ বনচারিণী গিরিনন্দিনী নিবিড় অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার নির্দ্দেশিত পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে এক খাসিয়া বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। গৃহস্বামিনী আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া 'পস্তরে'র বাড়ীতে লইয়া গেল। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার পর আহারের ডাক পড়িল। পরিবেশিকাটি যেন মূর্ত্তিমতী অপরিচ্ছন্নতা।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়াই দেখি দিনটা মেঘলা করিয়া আছে। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা সত্ত্বেও পাডুর পথে রওনা হইলাম। সহসা গুরু গুরু রবে গিরিশৃঙ্গে মেঘের মাদল বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই ঝমাঝম বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বেগতিক দেখিয়া এক খাসিয়া-বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইলাম। বাড়ীতে বাঁশের মাচার উপর তৈরি বুনো ঘাসে ছাওয়া একটি মাত্র ছোট দোচালা ঘর। তাহাতে দরজা-জানালা ইত্যাদির বালাই নাই। শুধু দুই দিকে দুইটি নিরতিশয় সঙ্কীর্ণ প্রবেশ-ও-নির্গমন পথ। সেই প্রায়ান্ধকার গৃহের সামনের কক্ষটিতে গনগনে আগুনের চারিপাশে দশ-বার জন বিরলবসন পাহাড়ী জটলা করিয়া বসিয়া মদ খাইতেছে। পিছন দিককার কক্ষে একটি স্ত্রীলোক রন্ধনকার্য্যে রত।

বৃষ্টি ধরিবামাত্র পুনরায় রওনা হইলাম। আন্দাজ সিকি মাইল চলিয়া একটি উৎরাইয়ের মাথায় পৌঁছিয়া নীচের দিকে তাকাইবামাত্র মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। টুক্‌রা টুক্‌রা পাথর-বিছানো উৎরাই-পথ একদম খাড়াভাবে যেন অতলে নামিয়া গিয়াছে। বারিধারা-নিষিক্ত পিচ্ছিল প্রস্তরখণ্ডসমূহের উপর দিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে চলিয়া

আমরা পর্ব্বতাবরোহণ করিতে লাগিলাম। উৎরাইয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ অতিক্রম করিবার পর ক্ষান্তবর্ষণ আকাশে রোদের ঝিকিমিকি দেখা দিল। উৎরাইটির শীর্ষদেশে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই বহুদূরাগত একটা তুমুল গর্জ্জন আমাদের কানে পৌঁছিয়াছিল। যতই আমরা নীচে নামিতে লাগিলাম, সেই গর্জ্জনধ্বনি উত্তরোত্তর ততই প্রবর্দ্ধমান হইতে লাগিল। উৎরাইয়ের নিম্নতম স্থানে পৌঁছিয়া দেখি উত্তর-পূর্ব্ব দিকস্থ আকাশচুম্বী পাহাড়ের পাষাণ-বক্ষ বিদারণ করিয়া এক পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী বহু নিম্নে অবতরণপূর্ব্বক দুই ধারের শিলাময় তীরভূমির মাঝখান দিয়া দুর্ব্বার বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমরা যেখানে নামিয়াছি, সেখানে এক বিরাট্ বনস্পতি নদীর এপার-ওপার গুটিকতক সুদৃঢ় এবং সুদীর্ঘ শিকড় চালাইয়া দিয়াছে। পাহাড়ীরা শিকড়গুচ্ছের উপর একটি বাঁশের সাঁকো তৈরি করিয়াছে। প্রকৃতি-মাতার এই সহায়তাটুকু না পাইলে পাহাড়ীদের পক্ষে এই নদী পারাপার করা কস্মিনকালেও সম্ভবপর হইত না।

সাঁকোর উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশের ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যরাশি দুই চক্ষু ভরিয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম। মাথার উপর আমাদের শাখায়িত বনস্পতির পল্লবঘন শ্যাম উত্তরচ্ছদ, নিম্নে গর্জ্জমান তটিনীর ফেনিলোচ্ছল অপ্রতিহত জলপ্রবাহ। বৃক্ষমূল-সমেত বাঁশের সাঁকো প্রবল স্রোতোবেগে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। চতুষ্পার্শ্বে বর্ষাপুষ্ট সবুজ সতেজ শাল, শিরীষ ইত্যাদি মহীরুহে সমাচ্ছন্ন নির্ঝরস্তনিত পর্ব্বতশ্রেণী সুদৃঢ় প্রাকারের মত দৃষ্টি-সীমা অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; মনে হয় যেন পৃথিবীটা পাহাড়ের এই প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যেই সীমায়িত। বর্ষণস্নাত শ্যাম বৃক্ষপল্লব সদ্য-উন্মেষিত অরুণালোকে মখমলের মত ঝলমল করিতেছে। গিরিগাত্রস্থ শ্যামল কান্তার

অগণিত ঝিল্লীরবে নিনাদিত। স্রোতস্বিনী এবং নির্ঝরসমূহের বজ্রগর্জ্জনের সঙ্গে ঝিল্লীকণ্ঠের সংমিশ্রণে এক প্রকার সুমধুর ধ্বনির সৃষ্টি হইয়াছে।

এই অনুপম পার্ব্বত্য দৃশ্যে একেবারে অভিভূত হইয়া বহুক্ষণ সাঁকোর উপর দাঁড়াইয়া রহিলাম, তার পর সাঁকোটি পার হইয়া এক উত্তুঙ্গ চড়াই বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। চড়াইটি অতিক্রম করিয়া চার-পাঁচমাইল হাঁটিয়া বুডেং নামক এক গ্রামে পৌঁছিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় পাড়ুযাত্রী এক খাসিয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গ লইল।

খানিক বিশ্রামান্তে আমরা পুনরায় পথচলা আরম্ভ করিলাম। বনানীমণ্ডিত পাহাড়শ্রেণী অতিক্রম করিয়া এখন আমরা বৃক্ষলতাহীন সমতল গিরিতটের উপর দিয়া চলিতেছি। এই দিগন্তবিসর্পিত শালভূমির অতিদূর প্রান্তস্থিত, দিগ্বলয়-ঘেঁসা ক্রমসূক্ষ্মায়মান একটি পাহাড়ের মাথার উপরকার আকাশে দ্বিতীয়ার এক ফালি বাঁকা চাঁদ উদীয়মান। তারাভরা অবারিত আকাশের নীচে বিরাট্ অধিত্যকা জুড়িয়া গভীর মৌন প্রশান্তি।

রাত্রি আন্দাজ আটটা নাগাদ পাড়ুতে পৌঁছিয়া এক বাঙালী ডাক্তারবাবুর আস্তানায় গিয়া উঠিলাম। সেখানে আরও দুই জন নবাগত বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় হইল। ইহারা ময়মনসিংহের নিম্নশ্রেণীর লোক, জীবিকার সংস্থান করিবার উদ্দেশ্যেই এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ পাড়ুতে আসিয়াছে।

পরদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকাইয়া আমরা তিন জনে একটি খাসিয়াকে সঙ্গে করিয়া অভ্রখনির সন্ধানে রওনা হইলাম। মাইল-তিনেক চলিয়া বাঁ-দিককার একটা সুঁড়িপথ ধরিয়া নীচে নামিতে নামিতে অবশেষে পাহাড়ের ঢালুতে আসিয়া থামিলাম। বনপ্রান্ত দিয়া একটি অনতিগভীর গিরি-নদী বহিয়া যাইতেছে। স্বল্পতোয়া

নদীটির গর্ভে অভ্রের চাংড়া, নিকটেই কালোমত একটা উঁচু অভ্রের ঢিবি। এ অঞ্চলের আশে-পাশে নাকি অনেকগুলি অভ্রের খনি বিদ্যমান। আমাদের পথ-প্রদর্শক কিন্তু সেখানে যাইতে রাজী হইল না। এক জন সঙ্গী মহা উৎসাহে নদীগর্ভ হইতেই অভ্র সংগ্রহ করিতে লাগিল।

দুর্গম রাস্তাটা বেলাবেলি পার হওয়া দরকার, সুতরাং ফিরিবার উদ্যোগ করিলাম। পূর্ব্বোক্ত সঙ্গী আন্দাজ আধ মণ অভ্র নিজেই পিঠে করিয়া বহিয়া লইয়া চলিল। পথশ্রমে সে অতিশয় ক্লান্ত, তথাপি অভ্রের বোঝা ত্যাগ করিবে না। এদিকে সন্ধ্যা আগতপ্রায়, সামনে একটা মস্তবড় খাড়াই। কিছুদূর উঠিয়াই বেগতিক দেখিয়া সে অভ্রখণ্ডগুলি ফেলিয়া দিল। চড়াইটির মাথায় পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তাহার অভ্রশোক একেবারে অভ্রভেদী হইয়া উঠিল।

দুর্গম রাস্তা পার হইয়া এখন অন্ধকারাবৃত বনবীথিকার ভিতর দিয়া আমরা চলিয়াছি। মাথার উপরকার ঘন পত্রাচ্ছাদন তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদকে আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। অকস্মাৎ পথের উভয় পার্শ্বে এক বিচিত্র দ্যুতিমণ্ডিত দৃশ্য দেখিলাম। বনভূমিতে আলো-আঁধারির এ কি অপরূপ মায়া! দুই ধারে বনঝোপের ডালে ডালে লতায়-পাতায় কোন মায়াবী যেন অগণিত মায়া-প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। নিস্তব্ধ নিষুপ্ত নিশীথে নিবিড় কান্তারে আজ যেন দীপালি উৎসবের দীপ্ত সমারোহ। জঙ্গলের ভিতর হইতে একটা ডাল ভাঙিয়া দেখি, আমার হস্তস্থিত প্রশাখাটি হইতে শুভ্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে।

গভীর রাত্রে আস্তানায় পৌঁছিয়া আমরা গল্পগুজবে মাতিয়া উঠিলাম। শুধু আমার সেই সঙ্গী মনের দুঃখে এক ধারে পড়িয়া রহিল—আধ মণ অভ্রের শোক বেচারা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

মিকিরদের মুলুকে

সিণ্টেংদের দেশ জোয়াইয়ে অবস্থান-কালে জনৈক সিণ্টেং বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হই যে, শিলং হইতে যে মোটর-রাস্তাটি গৌহাটী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, তাহার তিন চতুর্থাংশ অতিক্রম করিলেই নাকি মিকিরদের বস্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই খবর পাইয়া, জোয়াই হইতে গৌহাটি পর্য্যন্ত আটানব্বই মাইল, পায়ে হাঁটিয়া ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প আমার মনে জাগিল। ভগবান সদয় হইয়া এই অভিযানে আমার সহযাত্রী হওয়ায় আমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইল। বাস্তবিকই জোয়াই রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ভগবানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে সঙ্গীরূপে না পাইলে একাকী এই জনমানবহীন পার্ব্বত্য পথে পদব্রজে ভ্রমণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠিত না। আমরা যেদিন জোয়াই হইতে মিকিরদের মুলুকের উদ্দেশে রওনা হই সেদিন ছিল হাটবার। অরণ্য-পথে বাহির হইয়া দেখি, আমাদের পরিচিত খাসিয়া মেয়েরা দল বাঁধিয়া শিলঙের হাটে বেসাতি করিতে রওনা হইয়াছে। আমাদের তাহারা 'শানো লাই ফি' 'লানো ফিন ওয়ান'? (কোথায় যাচ্ছ, কবে ফিরবে?) ইত্যাদি নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। প্রায় সতেরো মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অপরাহ্ণ কালে আমরা অরণ্য-মধ্যস্থিত একটি বিশ্রান্তি-ভবনে আশ্রয় লইলাম। জায়গাটি জনমানবশূন্য, চারিদিকে অনন্তপ্রসারিত ছেদহীন নিবিড় অরণ্য। বনভূমিতে ঐকতান বাদনের মত অবিশ্রান্ত শোনা যায় একটানা ঝিল্লীরব, মাঝে মাঝে অনতিদূরস্থ জঙ্গলের ভিতর হইতে নানা হিংস্র জন্তুর আওয়াজ কানে আসে, ভয়ে গা—টা ছম্ ছম্ করিতে থাকে।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া আবার সুরু করিলাম পথ-চলা। শিলঙে যখন পৌছিলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়।

পূজার চারিটি দিন শিলঙে কাটাইয়া বিজয়া দশমীর পরের দিন পাহাড়িয়া পথে বাহির হইয়া পড়া গেল। রাস্তায় কোথাও খাবার পাইবার সম্ভাবনা নাই—তাই একটা টিনের চোঙে করিয়া কিছু ভাত-তরকারী লওয়া গেল। ছয়সাত মাইল পর্য্যন্ত রাস্তা বেশ সমতল আর ছায়াশীতল। ইহার পর সুরু হইল পাহাড়ের উপর দিয়া দুর্গম সর্পিল পথ। পথের উভয় পার্শ্বে কোথাও দীর্ঘপত্রসমন্বিত পাইন-শ্রেণী, কোথাও নানা আরণ্য-বৃক্ষের দুর্ভেদ্য জঙ্গল, কোথাও বা দূরে ঢেউ-খেলানো বৃক্ষবিরল পাহাড়ের ডগায় পায়রার খোপের মত পাহাড়ীদের ঘর-বাড়ী,—এমনিতর নানা বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ঘন বনের নিবিড়তার ভিতর দিয়া পথ চলিতে লাগিলাম।

কয়েক মাইল আগাইবার পর বাঁদিকে উপলাস্তৃতবক্ষ, খরস্রোতা একটি গিরিনদী নজরে পড়িল। শিলা হইতে শিলান্তরে লাফাইয়া লাফাইয়া নদীটি ছুটিয়া চলিয়াছে দুর্ব্বার বেগে। নদীর তুমুল গর্জ্জনের সঙ্গে ঝিল্লী-রব আর বন-বিহঙ্গের কণ্ঠস্বরের সংমিশ্রণে এক বিচিত্র একতানের সৃষ্টি হইয়াছে।

দ্বিপ্রহর নাগাদ শিলং হইতে আঠারো মাইল দূরবর্ত্তী নয়াবাংলা নামক স্থানে পৌছিলাম। রাস্তার পাশেই পথিকদের বিশ্রামের জন্য ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘর। ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, পান্থশালাটির সর্ব্বজীবে সম দয়া। সেটির দ্বার শুধু পথশ্রান্ত মানুষের জন্যই নয়, গহন অরণ্যে যদৃচ্ছা বিচরণশীল পশুযূথের জন্যও সারাক্ষণ অবারিত। গৃহমধ্যে একদিকে অর্দ্ধভগ্ন ধূলিধূসরিত একটি তক্তপোষ, মাঝখানে গুটিকতক ইটের তৈরি উনুন; সেগুলির পাশেই কতকগুলি এঁটো পাতা এবং উচ্ছিষ্ট অন্নের ছড়াছড়ি।

আরেক দিকে স্তূপীকৃত তৃণরাশির নিকটেই গোবর অশ্ববর প্রভৃতির জঞ্জাল। মোটের উপর ঘরটার যা হাল তাহাতে মুহূর্ত্তকালও সেখানে তিষ্ঠানো অসম্ভব। এই নরককুণ্ডে যাহারা দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছে নিশ্চয়ই তাহাদের পরমহংস অবস্থা।

একটা গাছের ছায়ায় খানিক জিরাইয়া অনতিদূরস্থ ঝরণাতলায় স্নান করিতে গেলাম। স্নানান্তে কতকগুলি গাছের পাতা কাটিয়া আনিয়া আহার্য্য দ্রব্যগুলির সদ্ব্যবহার করা গেল। আমাদের মতলব সেই দিনই নংপোতে পৌঁছিব। সেইজন্য খাওয়া-দাওয়ার পরই পা চালাইয়া দিলাম। দূরে গিরিসানুদেশে খাসিয়াদের কুটিরগুলিকে দেখাইতেছে ঠিক যেন ছবির মত। চারিপাশে তাদের চষা ক্ষেত, পাহাড়ের নীচেকার গড়ানে জায়গায় গোরু-বাছুর চরিয়া বেড়াইতেছে। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নীল গিরিশিরে এবং শ্যামায়মান বনভূমিতে নিবিড় হইয়া আসিল। একটু বাদেই শুক্লা একাদশীর খণ্ড চাঁদ পাহাড়ের পিছন দিক দিয়া আকাশে উঠিল। জ্যোৎস্নাধৌত আকাশের এক প্রান্তে শুভ্র মেঘরাশি পুঞ্জীকৃত। বাঁদিকে জঙ্গলের উপর খানিকটা চাঁদের আলোয় চিকমিক করিতেছে, বাকী অংশটুকু নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারে আবৃত। আলো-অন্ধকারখচিত অরণ্য-শীর্ষের সে এক অপূর্ব্ব শোভা। স্থানে-স্থানে পত্র-নিবিড় অরণ্য-শীর্ষের অবকাশ-পথ দিয়ে ঝরিয়া পড়া রূপালি-জ্যোৎস্না যেন অন্ধকার বনপথের ওপর বিচিত্র আল্পনা আঁকিয়া দিয়াছে। নিষুপ্ত নিশীথে নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে বাস্তবিকই মনে হইতেছিল যেন চিরদিনকার পরিচিত পৃথিবী ছাড়িয়া কোন এক রহস্য-ঘেরা মায়া-লোকের অভিমুখ আমাদের যাত্রা সুরু হইয়াছে। সেই গিরি-নদীটিও চলিয়াছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। পাহাড়ের গা বাহিয়া জ্যোৎস্নার আলো সারা দেহে তার অজস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। অনেকটা রাস্তা

অতিক্রম করিয়া দেখি, নদীটি হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেছে। নদীটিকে আর দেখিতে পাইলাম না বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ অবধি দূরাগত একটা তুমুল গর্জ্জন কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল।

জঙ্গল ছাড়াইয়া অবশেষে ছোট্ট একটি টিলার মাথায় পৌঁছিয়া, একটি শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া চন্দ্রকরস্নাত বনভূমির রহস্যঘন অপরূপ রূপায়ণ অবলোকন করিতে লাগিলাম। কোন মায়াবীর সোনার কাঠির স্পর্শে আমাদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টির সুমুখে যেন এক অপরূপ রূপলোকের সৃষ্টি হইয়াছে। জ্যোৎস্নালোকিত বনানী যেন রূপার তাজ মাথায় পরিয়া সুদূরের স্বপ্ন দেখিতেছে।

যে স্থানে আমি মিকিরদের সংস্পর্শে আসি দীর্ঘকালান্তরে সে-জায়গার নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু একথা বেশ মনে আছে যে, নংপোতে একটা দোকান-ঘরে ভূমি-শয্যায় রাত কাটাইয়া, পরদিন ভোর হইতে বেলা দুইটা নাগাদ হাঁটিয়া, এক গ্রামে পৌঁছিয়া রাস্তার পাশেই একটা বেড়াহীন ঘরে আমরা আশ্রয় লইয়াছিলাম এবং স্থানীয় বাজার হইতে হাঁড়িকুঁড়ি এবং চালডাল ইত্যাদি কিনিয়া ঘরের ভিতর ইট দিয়া উনুন তৈরি করিয়া রান্না করিয়াছিলাম। এখানকার যে ছোট নদীটির ঘোলা জলে স্নান করিয়াছিলাম তাহার জঙ্গলাকীর্ণ তটভূমির ছবিটি পর্য্যন্ত যেন আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে। এখানে একটি ফরেষ্ট্ আপিস দেখিয়াছিলাম বলিয়াও মনে হইতেছে।

আমরা যেখানে আস্তানা গড়িয়াছিলাম সেখান হইতে অনতিদূরে পাহাড়ীদের কতকগুলা বস্তি, এই বস্তির অধিবাসীদিগকে দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, ইহারা খাসিয়া হইতে ভিন্ন জাতীয়। স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি যে, ইহারাই মিকির নামে পরিচিত।

আসামের অন্যান্য আদিম জাতীয় লোকদের সঙ্গে মিকিরদের আকৃতিগত পার্থক্য প্রথমেই বিশেষভাবে নজরে পড়ে। নাগা, কুকি, লুসাই প্রভৃতির চেহারায় হিংস্রতার ছাপ সুপরিস্ফুট। মিকিরদিগকে দেখিলেই কিন্তু, নিরীহ গোবেচারী বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য পাহাড়ী জাতি ইংরেজগণ কর্তৃক পরাভূত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছিল স্বাধীন। কিন্তু মিকিররা সুদূর অতীতে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়া সুদীর্ঘকাল পরপদানত থাকার ফলেই এতটা শান্তভাবাপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে-সমস্ত জনশ্রুতি প্রচলিত আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের কপিলি নদীর ধারে খাসিয়াদের অধীনে তাহারা বাস করিত। কিন্তু বিজেতা খাসিয়াদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া অবশেষে তাহারা আহোমদের এলাকায় আশ্রয় লইতে কৃতসঙ্কল্প হয় এবং এই উদ্দেশ্যে নওগাঁ জেলার রহা নামক স্থানের অহোম শাসনকর্ত্তার নিকট জনকতক দূত প্রেরণ করে। ইহাদের দুর্ব্বোধ্য ভাষা বুঝিতে না পারিয়া সন্দেহবশে আহোমরা এই হতভাগ্য লোকগুলিকে একটি বাঁধের ধারে জীবন্ত অবস্থায় সমাহিত করে। ফলে, উভয় দলের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়া উঠে। অবশেষে শিবসাগরে আহোম রাজার নিকট এই সংবাদ পৌছিলে তিনি আপোষ করিয়া দেন এবং রাজ্যের এক অংশে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তখন হইতে অধিকাংশ মিকিরই অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাবে বাস করিতে থাকে।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ একদিন কতকগুলা মিকির আহোমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আহোমরা ইহাদের বিরুদ্ধে দুইটি সৈন্যদল প্রেরণ করে। একদল চাপানালার পেছন দিক দিয়া পাহাড়ে গিয়া ঢোকে এবং অন্যদল পশ্চাদভাগ হইতে আক্রমণ করিবার মতলবে কপিলি এবং যমুনা নদীর উজান বাহিয়া রওনা

হয়। উভয় দল পাহাড়ে একত্র সম্মিলিত হইয়া মিকিরদিগকে পরাস্ত করে এবং তাহাদের ঘরবাড়ী ও শস্যাগার প্রভৃতি আগুন দিয়া জ্বালাইয়া দেয়। মিকিররা তখন নানা ভেট সহ আহোম রাজার নিকট গিয়া ক্ষমা-ভিক্ষা করে।

এমনিভাবে বারংবার উৎপীড়িত হইয়া অবশেষে মিকিররা একেবারে শায়েস্তা হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত শোচনীয় দুর্ঘটনার পর আর কখনো তাহারা কোনোরকম উপদ্রব করিতে সাহসী হয় নাই। ক্রমে তাহারা এক নির্ব্বীর্য্য, নিরস্ত্র এবং যুদ্ধবিমুখ জাতিতে পরিণত হয়। অবশ্য কোনোকালেই নাগা-কুকিদের মত মানুষের মাথা কাটিয়া আনার অভ্যাস ইহাদের ছিল না।

বর্ত্তমানকালে মিকিররা প্রধানতঃ নওগাঁ এবং শিবসাগর জেলার মধ্যবর্ত্তী মিকির পাহাড়ে বাস করে। ইহা ছাড়া উত্তর-আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চল, নওগাঁ জেলা, খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়, কামরূপ এবং দরঙ্গ জেলায়ও মিকিরদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। নওগাঁ এবং কামরূপের সমতল অঞ্চলের অধিবাসী মিকিররা 'জুম'-কৃষির পরিবর্ত্তে, লাঙ্গল ইত্যাদির সাহায্যে জমি চষিয়া থাকে। আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িলেও, ইহাদের ভাষা এবং জাতীয় চরিত্র সর্ব্বত্র একই রহিয়া গিয়াছে। মিকির পাহাড়ে রেঙ্গমা নাগারা মিকিরদের প্রতিবেশীরূপে বাস করে। আগেকার দিনে নিরীহ মিকিরদের উপর ইহারাও কম অত্যাচার করে নাই। ইহারা অনেক সময় দলবদ্ধ হইয়া মিকিরদের চলাচলের পথের পার্শ্বে বনঝোপের আড়ালে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিত এবং কোনো মিকির যখন সওদা করিবার জন্য একাকী হাটে রওনা হইত, তখন অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া তাহাকে হত্যা করিত।

মিকির নামটি অসমীয়াদের দেওয়া। তাহারা নিজেদের আরলেং নামে পরিচিত করে। এড্ওয়ার্ড ষ্ট্যাক্ বলেন, 'আরলেং' মানে মনুষ্যজাতি। কিন্তু স্যার চার্লস লয়েল যথেষ্ট গবেষণা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, 'আরলেং' শব্দে শুধু মিকির জাতীয় লোকদেরই বুঝায়।

মিকিরদের গায়ের রং পীত। মেয়েদের মধ্যে কাহারো কাহারো চেহারায় বেশ শ্রী-ছাঁদ আছে। পুরুষদের অনেকেরই মাথার সামনের দিকটা কামানো, পেছন দিকে ঝুঁটি-বাধা দীর্ঘকেশ গ্রীবাদেশে বিলম্বিত।

মিকির পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদ খাসিয়াদের অনুরূপ। মেয়েদের পরিধেয়গুলা বেশ নয়নাভিরাম, পরনে তাহাদের লাল-শাদা ডোরা-কাটা এণ্ডির ছোট কাপড়। এগুলা একটি নক্সা-কাটা কোমর-বন্ধের সাহায্যে কটিতে আটকানো থাকে। দেহের উত্তরার্দ্ধ, বুকের উপর গ্রন্থিবদ্ধ একটি চাদর (জি-সো) দ্বারা আচ্ছাদিত। মাথায় ঘোমটা দেওয়ার অভ্যাস মিকির মেয়েদের নাই। মেয়েরা সমর্থত্ব প্রাপ্ত হইলে পর কপালে, নাকে, ওষ্ঠে এবং গালে উল্কি পরে। এদের কর্ণ-ভূষণ ছাড়া অন্যান্য গয়নাগাঁটি সিণ্টেং মেয়েদের গহনার মত। মিকির পুরুষেরা পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে ভীমরাজ পাখীর পালক পাগড়ীতে পরিয়া থাকে।

মিকিরদের বাড়ীগুলা লম্বালম্বিভাবে স্থাপিত কতকগুলি কাঠের খুঁটির উপর তৈয়ারি। ঘরের মেঝে মাটি হইতে অন্ততঃ চার পাঁচ হাত উপরে অবস্থিত। মিকিররা পোশাক-পরিচ্ছদ, গয়নাগাঁটি ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিজেতা খাসিয়া এবং সিণ্টেংদের অনুকরণ করিয়াছে, কিন্তু এ ধরণের গৃহ-নির্ম্মাণ প্রথা ইহাদের নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্য। খাসিয়াদের মধ্যে, কিম্বা মিকিরদের প্রতিবেশী অন্যান্য পাহাড়ী জাতির মধ্যে কাঠের খুঁটির উপর গৃহ-নির্ম্মাণের রীতি প্রচলিত নাই।

অন্যান্য পাহাড়ী মেয়েদের ন্যায় মিকির নারীরাও খুব কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। তাহারা নিজ নিজ ক্ষেত্রজাত তুলা হইতে সূতা কাটিয়া তাঁতে কাপড় বোনে। ইহারা শীতকালে ব্যবহারোপযোগী একপ্রকার মোটা এঁড়ির চাদরও তৈয়ার করে। এগুলিকে বলে 'বর-কাপোর'। বস্ত্রাদি মেয়েরা নীল এবং লাল রঙে রাঙায়।

আগেকার দিনে, ব্যবহার্য্য যাবতীয় জিনিষ যেমন দা, ছুরি, সূচ, মাছ ধরিবার বড়শী, এমন কি মেয়েদের হার, চুড়ি, আঙটি, কর্ণভূষণ প্রভৃতি সোনা-রূপার গয়নাগাঁটি পর্য্যন্ত মিকিররা নিজেরাই তৈয়ার করিত। কিন্তু আজকাল সাধারণতঃ সমতল অঞ্চল হইতেই এ-সমস্ত জিনিষ ইহারা কিনিয়া থাকে। সভ্যজগতের সহিত মেলামেশার দরুন ইহারা যেন আজকাল কতকটা শ্রমবিমুখ হইয়া উঠিতেছে এবং নিজেদের শ্রম-শিল্পের প্রতি উপেক্ষা ইহাদের দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে।

মিকিররা সঙ্ঘ-জীবনের অনুরাগী। প্রত্যেক বস্তিতেই ছেলে-ছোক্‌রা ও অবিবাহিত যুবকেরা মিলিয়া একটি দল গঠন করে। ইহাকে বলে 'রি-সো মার' অর্থাৎ তরুণ-সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের সভ্যেরা গাঁওবুড়ার † বাড়ীতে বাস করে। তাহারা নিজ নিজ বাড়ী হইতে আহার্য্য আনাইয়া সকলে মিলিয়া গাঁওবুড়ার বাড়ীতে একত্রে আহার করে। 'রি-সো মারের সভ্যদিগকে পালা করিয়া গ্রামের সকলের ক্ষেতে গিয়াই বিনা মজুরিতে কৃষি-কর্ম্ম করিতে হয়। ইহারা নৃত্য-গীতে গ্রাম্য আমোদ-উৎসবগুলিকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলে।

আগেকার দিনে অবিবাহিত মিকির যুবকেরা নাগা যুবকদের মত সকলে মিলিয়া আলাদা একটি বাড়ী তৈয়ার করিয়া সেখানে বাস

† কথাটা অসমীয়া ভাষা হইতে ধার করা—মানে 'গ্রাম-প্রধান'।

করিত। ইহাকে বলা হইত তেরাং'। গাঁওবুড়ার বাড়ীতে থাকিবার নিয়ম হওয়া অবধি 'তেরাং' নির্ম্মাণ-প্রথা লোপ পাইয়া গিয়াছে।

ভাত ইহাদের প্রধান খাদ্যদ্রব্য। নাগা প্রভৃতি আসামের কোনো কোনো আদিম জাতি যেমন সর্ব্বভুক্, ইহারা তেমন নয়। ইহারা গো-মাংস খায় না; গো-দুগ্ধেও ইহাদের অরুচি। ছাগল, শূকর, মুরগী ইত্যাদি প্রধানতঃ উৎসবাদি উপলক্ষেই খাওয়া হয়। গুটিপোকা ইহাদের একটি প্রিয় খাদ্য। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাঁকড়া ইঁদুর ইত্যাদি খাইতে বড় ভালবাসে। ইহারা মাঝে মাঝে ধেনো মদ তৈয়ার করিয়া খায় বটে, কিন্তু নেশার মধ্যে আফিমের উপরই ইহাদের অত্যাসক্তি। অন্যান্য পাহাড়ী জাতির লোকেরা আফিম খায় না। মিকিররা নিজেদের নিকটতম প্রতিবেশী অসমীয়াদের নিকট হইতেই আফিং খাওয়া শিখিয়াছে।

মিকিররা প্রধানতঃ চিণ্টং রং-হাং এবং আমরি এই তিনটি শাখায় বিভক্ত। মিকির পাহাড় চিণ্টংদের দ্বারা অধ্যুষিত, উত্তর-কাছাড় এবং নওগাঁ জেলার পার্ব্বত্য অঞ্চলে রংহাংদের বাস, আমরিরা খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ে বাস করে। মিকিররা খাসিয়াদের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হইলেও, একটি বিষয়ে এই দুইটি জাতির মধ্যে সম্পূর্ণ অমিল দেখা যায় এবং এই দুই জাতির সমাজ-ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ বিপরীত তাহা প্রমাণিত হয়। খাসিয়াদের মধ্যে মাতৃ-প্রাধান্য-প্রথা (Matriarchy) প্রচলিত, তাহাদের সমাজে কন্যারাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। কিন্তু মিকিরদের মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার পিতা হইতে পুত্রে অর্শে। মৃতব্যক্তির স্ত্রী এবং কন্যাদের ভাগ্যে কানাকড়িটিও জোটে না। অবশ্য মৃত-ব্যক্তির কোনো ছেলে কিম্বা ভাই না থাকিলে তাহার বিধবা পত্নী স্বামীর 'কুর' বা গোষ্ঠীতে বিবাহ করিয়া সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে।

গ্রামবাসীদের ছোটখাটো ঝগড়াঝাঁটির মীমাংসার ভার 'মে' নামক একটি গ্রাম্যসংসদের হাতে ন্যস্ত থাকে। 'মে'র কর্ম্ম-কর্ত্তাদিগকে বলা হয় 'গাঁওবুড়া'। জনকতক গাঁওবুড়াকে লইয়া 'মে পি' নামে আর একটি উচ্চতর গ্রাম্য-পরিষদ্ আছে। ইহার প্রধান কর্ম্ম-কর্ত্তা মৌজাদার। ব্যভিচার, যাদুবিদ্যা এবং তুকতাকের সাহায্যে লোকের প্রাণহানির প্রয়াস প্রভৃতি অপরাধের বিচার 'মে পি' দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। মিকিররা তাহাদের প্রতিবেশী অসমীয়া হিন্দুদের নিকট হইতে 'বৈকুণ্ঠ' 'নরক' প্রভৃতি নাম ধার করিয়াছে এবং তৎসমুদয় সম্বন্ধে নিজেদের মন-গড়া আদর্শও খাড়া করিরাছে। তাহাদের বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর মানুষ পাতালে যাইয়া 'যম রেচোর' (যম-রাজার) সহিত কিছুকাল বাস করে। ইহারা জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাসী। হিন্দুদের মতন ইহারাও মনে করে যে, মৃত্যুর পর মানুষ আবার নবজন্ম লাভ করে এবং এমনিভাবে পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত হয়।

'আরনাম কেথে' 'পেং' 'হেম্ফ্' প্রভৃতি ইহাদের অসংখ্য উপাস্য উপদেবতা আছে। অভ্রভেদী পর্ব্বত-শৃঙ্গ, গর্জ্জমান জলপ্রপাত প্রভৃতি যে-সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য হৃদয়কে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দেয়, সেগুলির এক একটি 'আরনাম' অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা দেবতা আছে বলিয়া ইহারা মনে করে। কামরূপের কামাখ্যা দেবীকেও ইহারা ভক্তি করিয়া থাকে। তা'ছাড়া কলেরা প্রভৃতি রোগের এক একটি অপদেবতা আছে বলিয়া ইহাদের ধারণা।

মিকিরদের মধ্যে স্ত্রী-ওঝা এবং পুরুষ-ওঝা দুই-ই আছে; পুরুষ-ওঝাকে বলে 'উচে', স্ত্রী-ওঝার নাম 'উচে-পি'। ইহাদের মধ্যে যাদুবিদ্যাতন্ত্র, মন্ত্র তুক্তাক প্রভৃতির বহুল প্রচলন আছে। ভবিষ্যতের শুভাশুভ জানিবার জন্য ইহারা নানা উপায় অবলম্বন করে। কাহারো দীর্ঘকালব্যাপী

কঠিন পীড়া হইলে আরোগ্য লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে কিনা উপদেবতার নিকট হইতে উচেপি তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে জানিয়া লয়। একজনের হাতের উপর লম্বা হাতলওয়ালা একটি দা রাখিয়া কতকগুলি মন্ত্র আওড়ানো হয়। মন্ত্রের প্রভাবে নাকি দায়ের মধ্যে দৈবশক্তির আবির্ভাব হয়। তখন রোগের হেতু কে তাহা জানিবার জন্য একটির পর আর একটি অপদেবতার নাম উচ্চারণ করা হয়। আসল নামটি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি দাটি থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে, এবং উচেপি দায়ের মধ্যে আবির্ভূত সেই উপদেবতার নিকট হইতে রোগীর ভবিষ্যৎ অবগত হয়।

ইহা ছাড়া, খাসিয়াদের ন্যায় ডিম ভাঙিয়া ভবিষ্যৎ জানিবার প্রক্রিয়াটিও মিকিরদের মধ্যে প্রচলিত আছে। স্যর চার্লস লয়েল, মেজর গার্ডনের 'The Khasis' নামক পুস্তকের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, মিকিররা খাসিয়াদের নিকট হইতেই এই দৈব প্রক্রিয়াটি শিখিয়াছে এবং আসামের আর-কোন আদিমজাতির মধ্যে ইহার প্রচলন নাই। এই তথ্যে কিছু ভুল আছে। মিলস্ সাহেব তাহার 'The Ao Nagas' নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"Egg breaking is practised by the Aos for the taking of omens. The omen being determined by the fall of the pieces of shell, as among the Khasis". * অর্থাৎ—আও নাগাদের মধ্যে

* মিলস সাহেবের The Ao Nagas নামক পুস্তকে (২৯৫ পৃঃ, ৩নং ফুট-নোট) আসামের জাতিতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর জি, এইচ, হাটন, এম, এ, আই, সি, এস, লিখিয়াছেন, যে, ডিম ভাঙ্গিয়া ভবিষ্যৎ কথনের প্রক্রিয়া বোর্ণিও, রোম এবং স্কটল্যাণ্ডের কোনো কোনো জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে।

হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্রের বারদোলী অবস্থান-কালে একটি বৃদ্ধা রমণী তাহাকে দেখিতে আসে এবং তাহার পায়ের কাছে একটি ডিম ভাঙ্গিয়া ভবিষ্যতে সকল বিষয়ে তাঁহার শুভ সূচিত হইতেছে একথা বলিয়া চলিয়া যায়। ইহা খাসিয়া প্রভৃতির মধ্যে প্রচলিত প্রক্রিয়াটিরই অনুরূপ কিনা তাহা নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণার বিষয়।

ডিম ভাঙিয়া ভাবী ঘটনার পূর্ব্বলক্ষণ জানিবার প্রক্রিয়াটির প্রচলন আছে। খাসিয়াদের মতই ডিমের খোলার টুকরাগুলি কোন স্থানে কিভাবে পতিত হয়, তাহা হইতে ভবিষ্যতের শুভাশুভ নির্ণীত হয়।

আগেকার দিনে অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে অবৈধ যৌন-সম্মিলন মিকিররা দূষণীয় বলিয়া মনে করিত না। প্রাপ্ত-যৌবনা কুমারীরা তখন অভিভাবিকাহীন অবস্থায় অবিবাহিত যুবকদের সঙ্গে একত্রে ক্ষেতে কাজ করিত, এমন কি 'তেরাঙে' আসিয়া রাত্রি যাপন পর্য্যন্ত করিত। † তখনকার দিনে ইহাদের সমাজে জারজ সন্তান আগাছার মতই জন্মাইত। আজকাল অসমীয়া হিন্দুদের সংস্রবে আসায় এ সমস্ত ব্যাপারে ইহারা সাবধান হইয়াছে। এখন কেবল উৎসবাদি ছাড়া আর সকল সময়েই অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের উপর কড়া নজর রাখা হয়। কুমার-কুমারীদের প্রণয়-লীলা আর প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। গোপনে তাহারা পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হয়। তাহাদের গুপ্ত প্রণয়ের কথা দৈবাৎ জানাজানি হইলে মেয়েটির বাপ স্বীয় কন্যার প্রেমাস্পদকে জামাতৃপদে অভিষিক্ত করিতে বাধ্য হয়। আসামের আও নাগা, লুসাই প্রভৃতি কোনো কোনো আদিম

† আও নাগাদের মধ্যে এখনো মোরাং (অবিবাহিত যুবকদের একত্রে শুইবার স্থান) হইতে ছেলেরা রাত্রিকালে কুমারীদের যৌথ শয়নাগারে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়।

The Ao Nagas by J. P. Mills

জাতির মধ্যে কিন্তু অবৈধ সম্মিলনের ফলে মেয়েটির গর্ভোৎপন্ন হইলেই শুধু তাহাদের পরস্পরকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করা হয়।

বিবাহিতা নরনারীর বেলায় কিন্তু, ব্যভিচারের জন্য মিকিরদের সমাজে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। যদি কোন বিবাহিতা স্ত্রী অথবা বিবাহিত পুরুষের ব্যভিচারের কথা লোকসমাজে ব্যক্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত অপরাধী-যুগলকে প্রকাশ্য স্থানে রজ্জুবদ্ধ করিয়া সমস্ত গ্রামবাসীর পরিহাস এবং তিরস্কারের বিষয়ীভূত করা হয়। 'মের' কর্ম্মকর্ত্তাগণ পুরুষটির নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিয়া তবে উভয়কে রেহাই দেয়। জারজ সন্তানাদির জন্ম না হইলে ব্যভিচারিণী নারীর স্বামী তাহাকে পুর্নগ্রহণ করে।

মিকিরদের অন্যতম জ্ঞাতি, মণিপুরের টাংখুল নাগারাও অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে অবৈধ যৌন-সম্মিলন ততটা দূষনীয় মনে করে না। কিন্তু বিবাহের পর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ইহাদের মতে বিবাহের পর থেকেই নরনারী প্রকৃত পক্ষে সামাজিক জীবে পরিণত হয়। সুতরাং, মিকিরদের মত ইহারাও মনে করে যে, বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ যদি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে তাহা হইলে সমাজ-শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতে পারে।

মিকিরদের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠা মামাতো বোনই সেরা পাত্রী বলিয়া বিবেচিত হয়। মামাতো বোন্ এবং পিসতুত ভাইয়ের মধ্যে বিবাহ নাকি আদর্শ বিবাহ। একপ্রকারে বিবাহের ফলে মিকিরযুবকের পিতৃশ্যালকের পুত্র তাহার নিজের শ্যালকপদে অভিষিক্ত হয়। আগেকার দিনে মামাতো বোনকে মনে না ধরিলে কোনো মিকির যুবক যদি তাহার পাণিগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিত তাহা হইলে

তাহার অবস্থা বড়ই কাহিল হইয়া দাঁড়াইত। পরম পূজনীয় মাতুল মহাশয় ভাগ্নের এই ধৃষ্টতা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে না পারিয়া বেদম প্রহার সুরু করিতেন এবং যে-পর্য্যন্ত না সে-বেচারা ভগ্নীর সহিত মধুর সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিত সে-পর্য্যন্ত কিছুতেই নিরস্ত হইতেন না। আজকাল অবশ্য মামাদের এই জবরদস্তির হাত থেকে ভাগ্নেরা রেহাই পাইয়াছে। এখন যদি কোন মিকির-যুবকের নিজের মামাতো বোনকে পছন্দ না হয়, তাহা হইলে বাপমায়ের উপর বরাত না দিয়া সে নিজেই নিজের পাত্রী নির্ব্বাচন করে।

উৎসব উপলক্ষে, নৃত্যাদির সময় পরস্পরের নিকট সংস্পর্শে আসার দরুন কোন তরুণ যদি কোন তরুণীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়, তাহা হইলে সে—হয় শুধু তাহার পিতাকে, নতুবা পিতামাতা উভয়কেই তাহার মনোনীতার বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়। কনের পিতামাতা বাগ্‌দান করিলে বরের বাপ কনেকে একটি আংটি অথবা চুড়ি উপঢৌকন দেয়। বাগ্‌দত্তা কন্যার যদি অন্যত্র বিবাহ হয় তাহা হইলে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ তাহার পিতৃ-পরিবার হইতে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা আদায় করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য কেবলমাত্র আংটি অথবা চুড়িটি ফিরাইয়া দিলেই লেঠা চুকিয়া যায়। বিবাহের দিন অবধারিত হইলে উভয় পক্ষের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে মদ্য প্রস্তুত করে। বরপক্ষ পথিপার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদিগকে মদ বিলাইতে বিলাইতে অপরাহ্ণ কালে কনের বাড়ীতে আসিয়া হাজির হয়। সেখানে সকলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর বরের পিতা এবং কন্যার পিতার মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়। কনের পিতা, যেন কিছুই জানে না, এমন ভাব দেখায়, বরের বাপকে মদ্যাদি সহ আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করে। বরের পিতা জবাব দেয়—"আপনার বোনের (মানে কন্যার

বাপের হবু বেহান্ ঠাকরুণের) এখন বয়স হইয়াছে। এখন সে আর একলাটি ঘরকন্নার কাজ-কর্ম্ম চালাইতে পারে না। তাই আপনার মেয়েকে পুত্রবধূরূপে আমাদের ঘরে লইয়া যাইতে আমরা আসিয়াছি।" কনের পিতা তখন বলে—"মেয়ে যে আমাদের আনাড়ী। সে তো তাঁত বুনিতে জানে না। ঘরকন্নার কাজকর্ম্মও তো তার ভাল করিয়া শেখা হয় নাই।" বরের বাপ জবাব দেয়—"কুচ্ পরোয়া নাই। আমরা তাকে সমস্তই শিখাইয়া দিব।" কনের মাতা তখন কনেকে এই বিবাহে সম্মতি আছে কি না সেকথা জিজ্ঞাসা করে। যদি বুঝা যায়, কনের বর পছন্দ হইয়াছে তাহা হইলে দুই বেহাই,মানে বর ও কন্যার পিতা উভয়ে একসঙ্গে পরমানন্দে প্রচুর পরিমাণ ধান্যেশ্বরীর সদ্ব্যবহার করিয়া সম্পর্কটাকে পাকাপাকি করিয়া নেন। কনে যদি কোন কারণে বাঁকিয়া বসে তাহা হইলে তাহাদিগকে সারারাত্রি তাহার সম্মতি আদায়ের জন্য ঠায় বসিয়া থাকিয়া সাধ্য-সাধনা করিতে হয়। এক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি চলে না। কনের সম্মতি লওয়া হইলে পর সকলে একত্রে পঙ্‌ক্তি-ভোজন করে। তারপর কন্যা গৃহের একাংশে স্বহস্তে বাসর-শয্যা রচনা করে। কোনো কোনো বর-পুঙ্গব আবার শুভ-রাত্রিতে বাসর-শয্যায় শয়ন করাকে বর্ব্বরোচিত মনে করিয়া অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করেন এবং নিজের একখানা পোশাক বিছানায় তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিবার জন্য কনের নিকট পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং স্থানান্তরে শয়ন করেন। পরদিন কন্যা স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীতে যায়। কাছাড়ী প্রভৃতি কোনো কোনো আদিম জাতির মত মিকিরদের মধ্যে কন্যাপণের প্রচলন নাই বটে; কিন্তু কনে যদি পিতামাতার একমাত্র সন্তান বা সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হয় তাহা হইলে বিবাহের পর জামাতাকে শ্বশুরালয়ে থাকিয়া জন খাটিতে হয়। এক-স্ত্রী-বিবাহই (Monogamy) ইহাদের

জাতীয় প্রথা, কিন্তু অসমীয়াদের দেখাদেখি সম্প্রতি বহুবিবাহ চালু হইয়াছে।

ইহাদের বাৎসরিক সার্ব্বজনীন গ্রাম্য উৎসবের নাম 'রংকের'। সাধারণতঃ জুন মাসে, কোনো কোনো গ্রামে বা শীতকালে উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে স্থানীয় পাহাড় এবং নদী প্রভৃতির অধিদেবতার নিকট ছাগল, মুরগী প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। বলির মাংস কেবলমাত্র পুরুষেরাই খাইতে পারে। উৎসব-রজনীতে তাহাদিগকে নিজ নিজ পত্নীর নিকট হইতে আলাদা শুইতে হয়। উৎসবের সময় মণিপুরের টাংখুল নাগাদের স্ত্রীর সহিত এক শয্যায় শয়ন তো নিষিদ্ধই, উপরন্তু তখন স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা রান্না করিয়া খাইতে হয়।

অবস্থাপন্ন মিকিররা বিপুল সমারোহের সহিত অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। ইহাই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান উৎসব। আসামের আর কোনো আদিম জাতিই মৃত-সৎকার-ক্রিয়া উপলক্ষে এত অর্থব্যয় ও এরূপ ধুমধাম করে না।

উৎসবটিকে যাহারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে চায় শবদেহটিকে তাহাদের এক সপ্তাহ হইতে বারো দিন পর্য্যন্ত গৃহমধ্যে রাখিতে হয়। উৎসব উপলক্ষে প্রচুর খাদ্য-পানীয়ের প্রয়োজন, তাই মৃতব্যক্তির বাড়ীতে চাল কোটা এবং মদ তৈয়ার করার ধুম পড়িয়া যায়। উৎসবের প্রথম দিন সন্ধ্যার পর গ্রামের ছোক্‌রাদিগকে ডাকিয়া পাঠানো হয়। তাহারা একটি মাদল (চেং) সহ আসিয়া হাজির হয়। একটি ছোক্‌রা তালে তালে মাদল বাজায় আর সকলে বাঁহাতে ঢাল ও ডান হাতে লাঠি নিয়া জোড় বাঁধিয়া বাটীর সুমুখের আঙ্গিনায় নাচিতে থাকে, অবশেষে ঢাল ও লাঠি পরিত্যাগ করিয়া তাহারা পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া চক্রাকারে নৃত্য আরম্ভ করে। প্রায় ঘণ্টাখানেক নাচিবার পর তাহারা নিজেদের আস্তানায়

ফিরিয়া যায়। পরদিন ভোরবেলায় আবার আসিয়া তাহারা নৃত্য আরম্ভ করে। ক্রমান্বয়ে তিনদিন এইরূপ ভাবে নৃত্যাদি হইলে পর চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে তাহারা নৃত্য-স্থানে একটি মুরগী মারিয়া খায়।

ইতিমধ্যে 'রি-সো-মার' অর্থাৎ তরুণ-সঙ্ঘের সভ্যেরা একটি শবাধার নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হয় এবং বয়স্ক লোকেরা সৎকার-ভূমিতে গিয়া একটি মাচা তৈয়ার করিলে পর মৃতের পরলোক-যাত্রার সুব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য উচেপিকে ডাকাইয়া আনা হয়। তার পর আসে মৃতের মাতৃকুলের একটি মেয়ে। তাহাকে বলা হয় 'অবকপি' অর্থাৎ 'শববাহিকা', তাহার কাজ পিঠে মদ্যপূর্ণ একটি লাউয়ের খোল বহন করিয়া শবানুগমন করা।

মধ্যরাত্রে মাদলের শব্দে বন-পথ মুখরিত করিয়া, অনেকগুলি জ্বলন্ত মশালসহ গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মৃতব্যক্তির বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া জমায়েৎ হয়। কুমার-কুমারীদের সেদিনকার বেশভূষার বাহার দেখিবার জিনিষ। মেয়েদের পরনে লাল ডোরা-কাটা এঁড়ির কাপড়, কালো বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মস্তক তাদের অবগুণ্ঠিত, অধরোষ্ঠ তাম্বূল রাগে রঞ্জিত। তরুণীরা ধরে তরুণদের কামিজে, আর তরুণরা ধরে তাহাদের নীবিবন্ধে এবং সকলে মিলিয়া বৃত্তাকারে নৃত্যে রত হয়। রাত পোহাইবার আগেই সাতজন যুবক ঘরের মাচায় গিয়া উঠে। তন্মধ্যে একজন ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া নাচিতে থাকে; বাকী ছয়জন দরজার নিকট দাঁড়াইয়া নৃত্য করে। নৃত্যাদি শেষ হইলে পর, নৃত্যকারী এবং সৎকার-সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত লোকদের জন্য একটি শূকর মারা হয়। উচেপি তাহা হইতে এক টুকরা মাংস রান্না করে। ঐ মাংসখণ্ড মৃতের একটি থালায় করিয়া, বাদ্যভাণ্ড বাজাইয়া শবদেহের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। অতঃপর তরুণ-সঙ্ঘের দুই তিনজনে একটি মুরগীকে সৎকার-ভূমির নিকটবর্ত্তী রাস্তার উপর লইয়া গিয়া মারিয়া রান্না করিয়া খায়। যুবকদের নৃত্যস্থানে একটি বাচ্চা শূকর

মারিয়া তাহার রক্ত দ্বারা একটি বাঁশের চোঙ্ ভর্‌তি করা হয়। রাস্তার উপর প্রোথিত আন্দাজ সাত ফুট লম্বা একটি সুদীর্ঘ বংশখণ্ড (বাঙ্গার) ঐ রক্তধারায় রঞ্জিত করা হয়।

এই সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে পর বয়স্ক লোকেরা শবদেহটিকে শবাধারে স্থাপিত করিয়া বাহিরে লইয়া আসে; এবং সকলে মিলিয়া একটি শোভাযাত্রা গঠন করিয়া বাঙ্গারটি সহ সৎকার-ভূমি অভিমুখে রওনা হয়। ঐ শোভাযাত্রার পুরোভাগে এক ব্যক্তি মাদল বাজাইতে বাজাইতে চলে।

শ্মশানে পৌঁছিয়া মৃতদেহটিকে চিতায় তুলিয়া দিবামাত্র স্ত্রীলোকেরা মৃতের জীবন-কাহিনী, মৃত্যুর পর তাহার গন্তব্যস্থল ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া শোকসঙ্গীত জুড়িয়া দেয়। চিতা যখন ধূ-ধূ করিয়া জলিতে থাকে তখন আবার কয়েকটি ছোক্‌রা নাচ সুরু করিয়া দেয়। মৃতদেহ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলে পর অস্থিগুলি একটি বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা হয়।

মিকিররা মৃতের উদ্দেশ্যে স্মৃতিস্তম্ভ (Monolith) নির্ম্মাণ করে। সেগুলা অবিকল খাসিয়াদের স্মৃতিস্তম্ভের অনুরূপ। মিকিররা খাসিয়াদের নিকট হইতেই এই প্রথা অনুকরণ করিয়াছে।

সৌন্দর্য্যোপাসক মণিপুরী

আসামের অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আকৃতি-প্রকৃতি, বেশভূষা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম্মানুষ্ঠান ইত্যাদি সকল বিষয়েই মণিপুরী জাতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের মধ্যে আর্য্যদের ন্যায় চেহারা-বিশিষ্ট অনেক নরনারী দেখিতে পাওয়া যায়, তাই অনেকে ইহাদিগকে আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পান। নবদ্বীপের গোস্বামীদের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর হইতে মণিপুরী সম্প্রদায়ও আদিম জাতির সহিত জ্ঞাতিত্বের কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা অনুভব করেন। কিন্তু ইঁহারা যে মূলত মোঙ্গোলীয় মহাজাতির কুকি-চিন গোষ্ঠীর অন্তর্নিবিষ্ট, ভাষাতত্ত্ববিদ্ সার্ জর্জ গ্রিয়ার্সন, নৃতত্ত্ববিদ সার্ চার্লস লয়েল ডাঃ ব্রাউন, মণিপুরী জাতি সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রাহক মিঃ টি, সি, হড্‌সন প্রভৃতি সকলেরই এ বিষয়ে ঐকমত্য আছে।

কিন্তু ইহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, আদিম জাতি হইতে উদ্ভূত হইলেও কেমন করিয়া ইহারা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এবং বিভিন্ন শিল্প- কলার অনুশীলনে এতদূর উৎকর্ষ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আসামের সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে একমাত্র ইহাদেরই নিজস্ব বর্ণমালা আছে। বর্ত্তমান লেখক মণিপুরে অবস্থানকালে পারিজাত সিং নামক জনৈক মণিপুরী ভদ্রলোকের নিকট মণিপুরী ভাষায় লেখা কতকগুলি পুরনো পুথি দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। মণিপুরীদের ভাষার নাম মৈ-তাই ভাষা। অনুসন্ধানের ফলে মৈ-তাই ভাষায় লেখা যে-সমস্ত ইতিহাস আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলিতে মণিপুরের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের বহু বীরত্ব-কাহিনী,

বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান-পতন ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

সৌন্দর্য্যের ইহারা চিরন্তন পূজারী। যে বিরাট্ উপত্যকা-ভূমিতে এই সৌন্দর্য্যোপাসক আদিম জাতির বাস, তাহা নয়ন-মনোহর, শ্যামসুন্দর। চতুষ্পার্শ্বে পাহাড়-ঘেরা, দিগন্তবিসারী হ্রদ, খাল-বিল-সরোবরে পরিপূর্ণ, বিচিত্রপুষ্পসম্ভারসমৃদ্ধ, শস্যশ্যামল মণিপুর-উপত্যকা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। এই মনোরম প্রাকৃতিক আবেষ্টনই মণিপুরীদের অন্তরে সৌন্দর্য্যানুভূতি এবং প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেমের সঞ্চার করিয়াছে।

মণিপুরের লোগতাক হ্রদে কতকগুলি পাহাড় ও ভাসমান দ্বীপ আছে। হ্রদগর্ভস্থ পাহাড়গুলিতে যে-সমস্ত নীচশ্রেণীর মণিপুরীদের বাস, তাহারা 'লই' নামে পরিচিত। শীতকালে হ্রদ যখন শান্ত থাকে, তখন অনেক লই-পরিবার ভাসন্ত দ্বীপগুলিতে বাঁশের মাচার উপর জলটুঙ্গি বাঁধিয়া বাস করে। তাহাদের ঘরবাড়িসমেত এই সমস্ত দ্বীপমালা, নীল কাচের মত স্বচ্ছ, শীতের নিস্তরঙ্গ হ্রদের বুকে দিনরাত অবিরাম স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিতে থাকে। এমনি ভাবে নীলকান্তমণির মত নীল আকাশের নীচে, অনন্ত নীলাম্বুরাশির বুকে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় দিনযাপন করিতে লইদের বড় আনন্দ। লোগতাক এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের স্বচ্ছন্দবনচারিণী সদাহাস্যময়ী মণিপুরী তরুণীদের নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার, চোখের সরল চাহনি, যাহাকে বলা চলে 'Sexless glare of infancy'—ইত্যাদি দেখিয়া সভ্য-জগতের সংস্রব হইতে দূরে, প্রকৃতির কোলে স্বাভাবিক নিয়মে আদিম নারীপ্রকৃতি কি ভাবে গড়িয়া উঠে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

মণিপুরীদের সহজাত সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের গৃহসজ্জায় এবং দেহসজ্জায়। মণিপুরী বাড়িতে নোংরামির লেশমাত্রও নাই। তাহাদের গৃহপ্রাঙ্গণ তকতকে ঝকঝকে, গৃহমধ্যে সুন্দর সুন্দর

আসবাব এবং মাজা-ঘষা চকচকে তৈজসপত্র যথাস্থানে সযত্নে রক্ষিত। মণিপুরী মাত্রেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে এবং পরিপাটিরূপে বেশভূষা করিতে ভালবাসে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই নিত্য স্নানান্তে কপালে এবং কপোলে চন্দনের অলকাতিলকা রচনা করে। মণিপুরী মেয়েদের মধ্যে অনেকেই রূপসী ও লাবণ্যময়ী। মাথায় তাহাদের রেশমের মত চিকন ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ। সমর্থত্ব প্রাপ্ত হইবার পরই কুমারীদের মাথার সামনের দিকের চুল ছোট করিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকারে ছাঁটিয়া ফেলা হয়। ইহাতে তাহাদের কচি কোমল মুখগুলি বড় সুন্দর দেখায়। মিসেস গ্রিম্‌উড তাঁহার 'My three years in Manipur' নামক পুস্তকে মণিপুরী মেয়েদের রূপলাবণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। মণিপুরী সুন্দরীরা প্রসাধনের জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করে। বর্ণাঢ্য, নয়নাভিরাম বেশভূষা ইহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে শতগুণে বাড়াইয়া তোলে। ইহাদের পুষ্প-প্রীতি এবং বিচিত্র বর্ণের প্রতি অনুরাগও অপরিসীম। তাহারা খোঁপায় বনফুলের মালা জড়াইয়া রাখে। পুষ্পাভরণ ব্যতিরেকে মণিপুরী-মেয়েদের প্রসাধন-পর্ব্ব সম্পূর্ণ হয় না। তাহাদের পরিধেয় ফানেক, জ্যাকেট, উত্তরীয় (ইনাফি) ইত্যাদি সমস্তই রঙিন এবং জমকালো। পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে মেয়েরা যখন বিচিত্র বসন আর কুসুমভূষণে সজ্জিত হইয়া উৎসব-স্থানের একধারে সার বাঁধিয়া বসে, তখন কি যে অপূর্ব্ব শোভা হয় তাহা বলিয়া বুঝানো যায় না।

বৈষ্ণবধর্ম্মের অফুরন্ত রস-মাধুর্য্য রস-পিপাসু, কোমলহৃদয় মণিপুরী জাতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের লীলারসাত্মক কীর্ত্তন শুনিয়া অনেক ভক্ত মণিপুরীকে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখা যায়। একটা আদিম জাতির মধ্যে এমনি ধরণের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, ভক্তিপ্রাণতা প্রভৃতি গুণাবলী কিরূপে বিকাশলাভ করিল, তাহা ভাবিলে

বিস্মিত হইতে হয়। ইহাদের এই সমস্ত জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিয়া মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় 'সত্তর বৎসর' নামক তাঁহার আত্মচরিতের এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "তাহাদের বর্ত্তমান স্বভাব, প্রকৃতি ও রীতি-নীতি দেখিয়া মনে হয় যে, ইহাদের ভিতরে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব পুরুষ-পরম্পরায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহাতে মহাপ্রভুর "অনর্পিতচরী" উন্নতোজ্জ্বল রসশ্রী ভক্তিলাভে ইহাদের বিশেষ অধিকার ছিল। রসের অনুশীলন মণিপুরীদের সহজসিদ্ধ। মনে হয় ইহারা চিরদিন, এমনই সহজ সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিল।"

বিপিনচন্দ্র অনুমান করেন যে, মণিপুরীরা এক সময় বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। ইম্‌ফলের যাকাইরোল (জাগরণ) নামক মণিপুরী মাসিকপত্রের সম্পাদক, ডাঃ লৈরেন সিং নিংথৌজমও একবার কথা-প্রসঙ্গে বর্ত্তমান লেখকের নিকট বলিয়াছিলেন যে, মণিপুরে এমন অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, যাহা মণিপুরীদের নিকট শিবের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আসলে তাহা বৌদ্ধমূর্ত্তি। হড্‌সন সাহেব কিন্তু মণিপুরে বৌদ্ধ-প্রভাবের কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, "There is not a sign of contact with the lofty moral doctrines of Buddhism." —এ বিষয়ে রীতিমত গবেষণা করিয়া প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা আবশ্যক।

বর্ত্তমান কালে বৈষ্ণবধর্ম্মকে ইহারা সমস্ত অন্তরের সহিতই গ্রহণ করিয়াছে। রাসপূর্ণিমা, রথযাত্রা, হোলি-উৎসব ইত্যাদি বৈষ্ণবদের সকল পরবই মহাসমারোহে মণিপুরে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাদের ঘরে বাহিরে অনুষ্ঠিত যাবতীয় উৎসবই মেয়েদের কল্যাণ-হস্ত-স্পর্শে শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠে। হোলি-উৎসব সাতদিন ব্যাপিয়া চলে। এই এক সপ্তাহকাল ইম্‌ফলের রাস্তাঘাটের উপর দিয়া যেন রঙের স্রোত বহিতে থাকে, তরুণ-

তরুণীরা রঙের খেলায় একেবারে মাতিয়া উঠে। রথযাত্রার সময় পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও প্রকাশ্য রাজপথের উপর দিয়া রথ টানিয়া লইয়া চলে।

বৈষ্ণবধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে মণিপুরে শৈব এবং শাক্ত হিন্দুধর্ম্মেরও প্রচলন হইয়াছে। ইম্ফল হইতে লোগতাক হ্রদে যাইবার পথে বিষেণপুর নামক স্থানে সিন্দূরলিপ্ত শিবলিঙ্গ, ভূপ্রোথিত ত্রিশূল ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ইম্ফল হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী হিয়াং থাং নামক স্থানে একটি প্রসিদ্ধ দুর্গামন্দির আছে। মণিপুর রাজ্যে দুর্গোৎসবের সময় খুব ধুমধাম হয়; কিন্তু দুর্গাপূজা উপলক্ষে বলিদানের রীতি সেখানে নাই। হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার কুসংস্কার, উৎকট গোঁড়ামি প্রভৃতিও ইহাদের সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, আমরা তো ইহাদের নিকট 'হরিজনে'রই সামিল। মইরাঙে ভ্রমণকালে আমি গোপাল সিংহ নামক জনৈক মণিপুরী ভদ্রলোকের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। জাত বাঁচাইবার জন্য বাড়ির লোকেরা গৃহের বাহিরে আমার আহার এবং শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মণিপুরীরা মাংসাহার বর্জ্জন করিয়াছে। মণিপুর রাজ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ। হিন্দুধর্ম্ম সেখানে এতটা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে যে, খ্রীষ্টান মিশনারীরা প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও একটিমাত্র মণিপুরীকেও খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু মণিপুরে আদিম ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি এখনো সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, 'মাইবা' অর্থাৎ আদিম ধর্ম্মের পুরোহিতগণের আজও সেখানে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। মণিপুরীদের উপাস্য অসংখ্য লাই বা উপদেবতা আছে এবং মণিপুরীরা যে-সমস্ত উপচারে ইহাদের পূজা করে, তাহা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নহে। খাসিয়াদের উ-থ্লেন পূজার ন্যায় ইহাদের মধ্যেও সর্প-পূজার প্রচলন আছে। কিন্তু খাসিয়াদের

ন্যায় মণিপুরীদের মধ্যে সর্পের প্রীত্যর্থে নরবলিদানপ্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া শোনা যায় না।

মণিপুরীদের সহজ সৌন্দর্য্যবোধ স্মরণাতীত কাল হইতে তাহাদিগকে বিভিন্ন কলাবিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত করিয়াছে। আমরা ইহাদিগকে শুধু নৃত্যকলানিপুণ বলিয়াই জানি; কিন্তু সঙ্গীতকলা এবং চিত্র-কলায়ও ইহাদের দক্ষতা বড় কম নহে। মণিপুরী মেয়েদের কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য অপরিসীম। তাহাদের মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত শুনিলে কেন যে মণিপুরীদিগকে গন্ধর্ব্বজাতি বলা হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান কালে ক্ল্যাসিকাল হিন্দুস্থানী সঙ্গীত অনেক মণিপুরী গায়ক-গায়িকা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে পারক হইয়াছে। ইম্‌ফলে একজন মণিপুরী ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল, রাগ-রাগিণী, তাল লয় মাত্রা, শ্রুতি প্রভৃতি সঙ্গীতের ঔপপত্তিক দিক সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ। বিজয়া দশমীর দিন রাজপ্রাসাদের নিকট দিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিতে যাইবার কালে একটি লৈছাবীর (কুমারী) মুখে মালকোষ রাগের বিশুদ্ধ আলাপ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

হড্‌সন সাহেবের 'The Meitheis' পুস্তকে ভদ্র সিং নামক জনৈক মণিপুরী শিল্পীর আঁকা 'খাম্বা ও থইবি'র কাহিনী-সম্পর্কিত যে-কয়েকটি ছবি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা উচ্চাঙ্গের অঙ্কন-কুশলতার পরিচায়ক। শিল্পীর নিপুণ তুলিকার টানে, দিগন্তস্পর্শী পাহাড়ের পটভূমিকায় খাম্বা ও থইবির জীবনের বিভিন্ন ঘটনা যেন জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এগুলি দেখিয়া মনে হয় যে, মণিপুরীদের একটা নিজস্ব অঙ্কন-শৈলী আছে। নৃত্য-উৎসবাদি উপলক্ষে মঞ্চসজ্জায়ও ইহাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। দারুশিল্প, গজদন্তশিল্প প্রভৃতি কারুকলায়ও ইহাদের নৈপুণ্য আছে। সবচেয়ে সুন্দর

ইহাদের নৃত্যকলা। ইহাই জগতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে এই কলানিপুণ আদিম জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বিনিময়ে ইহাদের নিকট হইতে এই অমূল্য রস-কলাসম্পদ আমরা পাইয়াছি। ইহার জন্য সভ্যজগৎ অনন্তকাল এই আদিম জাতির নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ থাকিবে। কোন্ সুদূর অতীতে যে এই অপূর্ব্বমনোহর নির্ম্মল নৃত্যকলা তাহাদের মধ্যে প্রথম বিকাশলাভ করিয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। বহু মণিপুরী নিজেদের মাতৃভূমি ছাড়িয়া সিলেট এবং কাছাড় জেলা এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরার নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাঙালীদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা নিজেদের অনেক সুন্দর সুন্দর জাতীয় প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বহুকাল যাবৎ বর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই কলাবিদ্যার সাধনায় প্রবাসী মণিপুরীরা বিমুখ হয় নাই বলিয়াই ইহা রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ কলারসিকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং সেইজন্যই আজ সমগ্র দেশ জুড়িয়া মণিপুরী নৃত্যের এত জয়জয়কার।

কয়েক বৎসর আগে শিলচরের নিকটবর্ত্তী মাছিমপুর নামক স্থানের মণিপুরী কুমারীদের নৃত্যলীলা দেখিয়া বর্ত্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর মুগ্ধ বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। প্রতিমা দেবী, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ প্রমুখ কলাবিদেরা নানা প্রবন্ধে মণিপুরী নৃত্য এবং মণিপুরী কাওয়ালী তালের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

মণিপুরীরা শুধু যে কলাবিদ্যার চর্চ্চাই করে তাহা নয়, দৈহিক শক্তির অনুশীলনও তাহারা করিয়া থাকে। মণিপুরী পুরুষদের দেহ সুগঠিত, বলিষ্ঠ এবং মাংসপেশীবহুল। পুরুষোচিত ব্যায়াম এবং ক্রীড়াদিতে তাহাদের যথেষ্ট অনুরাগ। মণিপুরীরা জাত-খেলোয়াড়। অনেকেরই হয়তো জানা নাই যে, পোলো (খাজাই সা না বা)

এবং হকি (খোং খাঙ্গাই) এই দুইটিই মণিপুরীদের নিজস্ব জাতীয় ক্রীড়া। ইম্‌ফলস্থ ইংরেজ রাজপুরুষগণ এই দুইটি ক্রীড়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই আজ সভ্যজগতে এগুলির এত প্রচলন হইয়াছে। খোং খাঙ্গাই অর্থাৎ হকি ক্রীড়ার প্রতিই মণিপুরীদের আসক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নগ্ন শিশুদের পর্য্যন্ত মহা উৎসাহে হকি খেলায় রত হইতে দেখা যায়। সময় সময় বিরাট্ জনতার সমক্ষে ছেলেদের হকি-প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে খগেনবার রাজত্বকালে মণিপুরে সুপ্রসিদ্ধ 'খাঙ্গাই সা না বা' অর্থাৎ পোলো খেলার প্রবর্ত্তন হয়। মণিপুরীরা বেঁটে, তেজী টাট্টু ঘোড়ার উপর চড়িয়া পোলো খেলে। বিপুল জনতার সমক্ষে মাথায় পাগড়ী-বাঁধা, বলিষ্ঠদেহ মণিপুরীরা পোলো খেলায় রত হইয়া যখন বিচিত্র ক্রীড়াকৌশল দেখাইতে থাকে, তখন দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সঞ্চার হয়। পোলো খেলায় মণিপুরীরা যেরূপ সাহস, নৈপুণ্য এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকে, তাহা বিস্ময়কর।

বাচ-খেলার রেওয়াজ মণিপুরে আজকাল আর ততটা নাই। প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও ইমফলে বাচ-খেলা দেখা আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। ডাঃ ব্রাউনের প্রবন্ধ হইতে এই প্রতিযোগিতার বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

"সেপ্টেম্বর মাসে তিন দিন ব্যাপিয়া রাজবাটীর পিছন দিককার খাতে বাচ-খেলা হয়। মণিপুরে অনুষ্ঠিত যাবতীয় উৎসবের মধ্যে ইহাতেই সবচেয়ে বেশি ধুমধাম হয়। খাতের উভয় তীরে দর্শকদের উপবেশনের জন্য অনেকগুলি মঞ্চ তৈয়ার করা হয়। তন্মধ্যে রাজার জন্য যেটি নির্ম্মিত হয় তাহা উচ্চ এবং বিশালায়তন। দৌড়ের নৌকাগুলি

আস্ত এক একটি গাছ কুঁদিয়া তৈয়ারি। দুইটি নৌকায় বিশিষ্ট জাঁকালো পোশাকে সজ্জিত প্রায় সত্তর জন লোক দাঁড় হাতে করিয়া বসে। এক ব্যক্তি নৌকার গলুইয়ের উপর একটি দাঁড়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং ডান পা দিয়া নৌকার উপর ঘন ঘন প্রচণ্ড আঘাত করিয়া প্রতিযোগীদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে থাকে। উৎসবের শেষ দিনে রাজা স্বয়ং তাঁহার নৌকায় হাল ধরিয়া প্রতিযোগীদের অনুগমন করেন। তাঁহার নৌকার অগ্রভাগে একটি হরিণের মাথা খোদাই করা এবং সেটির শিং সুবর্ণপাতে মণ্ডিত।"

বাচ-খেলার পরই উল্লেখ করিতে হয় লামচেল বা দৌড়-প্রতিযোগিতার কথা। ডাঃ ব্রাউন তাঁহার প্রবন্ধে ইহাও বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রতি-যোগীদিগকে আন্দাজ আধ মাইল রাস্তা দৌড়াইতে হয়। এই প্রতিযোগিতায় যে প্রথম হয়, তাহাকে সারাজীবনের জন্য রাজসরকারে বাধ্যতামূলক শ্রম (লালুপ) হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। রাজা রাজপথের উপর নির্ম্মিত একটি তোরণের নীচে বসিয়া প্রতিযোগিতার দৃশ্য অবলোকন করেন।

মণিপুরীরা আবার ওস্তাদ কুস্তিগীরও। কুস্তির সময় বাহ্বাস্ফোট ইত্যাদিও খুবই হয়।

মণিপুরী মেয়েরাও দৈহিক শক্তির সাধনায় পশ্চাৎপদ নহে। 'খাং জিং সানাবা' নামক একটি ক্রীড়ায় মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া থাকে। মিঃ হড্‌সন মণিপুরীদের সম্বন্ধে লেখা তাঁহার পুস্তকে এই ক্রীড়ার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা বড়ই চিত্তাকর্ষক। চন্দ্রালোকিত রাত্রে স্বচ্ছ সুনীল উন্মুক্ত আকাশের নীচে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা হয়। একটা লম্বা কাঁচা বাঁশের একদিকে ধরে অন্ততপক্ষে বারো জন পুরুষ এবং উক্তসংখ্যক মেয়েরা ধরে সেটির অন্য দিকে। তারপর এক দল অন্য দলের হাত হইতে বাঁশটি ছিনাইয়া লইবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে টানাটানি সুরু করে।

মণিপুরী মেয়েরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। মইরাঙের মণিপুরী মেয়েদিগকে নৌকা বাওয়া, জাল দিয়া মাছ ধরা, ক্ষেত্রে বীজ বপন ও শস্য কর্ত্তনাদি কঠোর পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মে লিপ্ত হইতে দেখা যায়। এমন মণিপুরী বাড়ী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যেখানে চরকা বা তাঁত নাই। মণিপুরী বস্তিতে বেড়াইতে গেলে দেখা যায়, বিরাট্ নাটমণ্ডপের মধ্যে সারি সারি তাঁত বসানো রহিয়াছে আর বিবাহিতা অবিবাহিতা সকল শ্রেণীর মেয়েরা নিজ নিজ জায়গায় বসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে কাপড়, গামছা ইত্যাদি বুনিতেছে।

রাজকুমারী থইবি আর তাঁহার প্রেমাস্পদ খাম্বার স্মৃতি-বিজড়িত মইরাঙে থাং জিং-এর মন্দির-প্রাঙ্গণের এক ধারে দুইটি প্রকাণ্ড শিলাপট্ট পড়িয়া রহিয়াছে। অমিতবলশালী খাম্বা নাকি একটা ষাঁড় এবং একটা বাঘকে এই দুইটি শিলাখণ্ডে বাঁধিয়া হত্যা করিয়াছিলেন।

মইরাঙে গেলে বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্রভেদী বিরাট্ মহিমা উপলব্ধি করিয়া হৃদয়ে গর্ব্ব অনুভব হয়। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন নির্জ্জন বন-প্রান্তরে ঘনাইয়া আসে, মইরাঙের দেবমন্দির তখন শঙ্খঘণ্টার আরাবে মুখরিত হইয়া উঠে, দলে দলে মণিপুরী স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া জমায়েৎ হয়, খোল-করতালের শব্দে কানে তালা লাগিয়া যায়, আর মেয়েরা সুললিত কণ্ঠে বাংলা কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে আরম্ভ করে মন্দির প্রদক্ষিণ। শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ধর্ম্মের শুভ্রোজ্জ্বল রশ্মিরাজি কেমন করিয়া যে অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা পার হইয়া সভ্যজগতের সংস্রব হইতে সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন আসামের এই আদিবাসী অধ্যুষিত নিভৃততম উপত্যকাভূমিতে আসিয়া প্রবেশ করিল, কেমন কবিয়া যে বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার কীর্ত্তন-গান এখানে এতটা প্রভাব বিস্তার করিল, তাহা ভাবিলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়।

মণিপুরে 'বকাসুর বধ'

মণিপুরের মেয়েদের নৃত্যের কথা আমি 'বিচিত্র মণিপুর নামক পুস্তকে বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছি। মণিপুরী ছেলেদের নৃত্যকলা সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। ইহার নাম 'সঞ্জইবা'। বর্ত্তমানকালে রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির বিষয়-বস্তু অবলম্বনে মণিপুরী ছেলেদের নৃত্য-পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে। 'বকাসুর বধ'ও এই ধরণের একটি নাচের পালা।

রাস-পূর্ণিমার দিন অপরাহ্নকালে ছেলেরা শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার অভিনয় করে। এতে একটি বিবাহিতা যুবতীকে যশোদার ভুমিকা অভিনয় করিতে হয়। যে-সমস্ত ছেলে এই নৃত্যাভিনয়ের সামিল হয়, তাদের মধ্যে দু'জনকে সাজিতে হয় কৃষ্ণ ও বলরাম, বাকি সবাই সাজে ব্রজের রাখাল। নাচিয়েদের মাথায় কাঁধ পর্য্যন্ত ঝোলা, ঢেউ-খেলানো পরচুলার উপর ময়ূর-পুচ্ছে শোভিত জরীদার আবরণী। গলায় পুঁতি এবং ভেল মুক্তার কয়েক নর মালা। কর্ণে কুণ্ডল, বাহুতে কেয়ূর এবং পায়ে নূপুর, সকলেরই গা আদুড়। পরনে নক্সাদার পেটি দিয়া কোমরে আটকানো সবুজ এবং লাল রঙে ছোপানো মালকোঁচা মারা রেশমী কাপড়, দুটি চিত্র-বিচিত্র মখমলী ফালি দুই পার্শ্বে দোলায়িত। কৃষ্ণের পরিধেয়, পীতধড়া, তার এক হাতে মুরলী, অপর হাতে পাঁচনি। কৃষ্ণ ও বলরামের ভূমিকা অভিনেতারা যতক্ষণ গান গহিয়া যশোদার কাছে গোষ্ঠে যাইবার অনুমতি মাগে, কৃষ্ণসখারা ততক্ষণ রংচঙে কাগজ-জড়ানো পাঁচন-

বাড়িগুলা ফিরাইয়া ঘুরাইয়া নানান্ ভঙ্গিমায় নর্ত্তন করে। তারপর যশোদার কাছ থেকে বিদায় লইয়া তাহারা অনতিদূরে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়া পৌঁছায়; সেখানে প্রকাণ্ড ভিড়, লোক গিস গিস করে। পূর্ব্বাহ্ণেই পুঁতিয়া রাখা একটি কলাগাছে কৃষ্ণ-বলরাম ঠেসান দিয়া দাঁড়ায় আর নাচিয়েরা বলয়াকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ পরে গালে চূণ-কালি মাখা এক ব্যক্তি দুইটা দইয়ের তিজেল বাঁকে করিয়া আসিয়া ছেলেদের সঙ্গে রঙ্গরস জুড়িয়া দেয়; ছেলেরা দধিভাণ্ড দু'টি উজাড় করিয়া ফেলে। তার পর সাদাটে মুখোস পরা দুইজন লোক রঙ্গস্থলে হাজির হইয়া লম্ফঝম্প করিয়া ধুন্ধুমার বাধাইয়া তোলে। ছেলেদের পাচনির পিটুনির চোটে কিন্তু শীঘ্রই তাহাদিগকে চম্পট দিতে হয়। সবশেষে কাগজের তৈরি একটি বিরাট্ আকারের বককে বহন করিয়া এক ব্যক্তি সেখানে আসিয়া হাজির হয়, এটি বকাসুরের প্রতীক। বাহকটির মাথা পাখীটার পেটের প্রকাণ্ড ফুটার ভিতর দিয়া গলানো। 'রাখাল' ছেলেরা এই বাহ্যমান বকের উপর আচ্ছা করিয়া পাচন-বাড়ির ঘা লাগাইতে থাকে, অবশ্য বাহকটির মাথা বাঁচাইয়া। অকস্মাৎ লোকটি সুড়ুৎ করিয়া পাখীটার ভিতরে ঢুকিয়া সজোরে হাত পা ছুঁড়িতে থাকে, এটা নাকি বকাসুরের মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। তখন কয়েকজনে পাখীসুদ্ধ তাকে বহিয়া লইয়া যায়।

বকাসুর বধের পালা সারা হইবার পর গীতবাদ্যের আরাবে হেমন্তের আবছা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মেঠো পথ অনুরণিত করিয়া সকলে ঘরে ফিরিয়া আসে। নাচিয়েরা এক উঠান সুবেশা পুরনারীর ভিড়ের ফাঁকে সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া যায়। আঙিনায় প্রোথিত একটি কলাগাছের চারা এবং সপত্র বেণু-প্রশাখার নিকট মঙ্গল-ঘট মাথায় লইয়া দাঁড়াইয়া

থাকে একটি লাবণ্যময়ী গৌরাঙ্গী কিশোরী। যশোদার ভূমিকা অভিনয়-কারিণী তরুণীটি ছেলেদের মাথায় তুলসীপাতা ছিটাইয়া দেয় এবং একটি কাঁসিতে অনেকগুলি ধূপকাঠি জ্বালাইয়া হস্ত দু'টি ছন্দায়িত করিয়া গোপালের নীরাজনা করে, আর তার পাশেই দাণ্ডায়মানা একটি যুবতী সুবলিত হস্তে চামর বীজন করে। সর্ব্বশেষে এরা দু'জনে ছেলেদের প্রসাদ খাওয়াইয়া দেয়।

এই অভিনয়ের মধ্যে আন্তরিকতার ভাবটি হৃদয়কে বিশেষ ভাবে স্পর্শ করে। গোষ্ঠে যাইবার জন্য কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণসখাদের অধীরতা, গোপালকে গোচারণে যাইতে দিতে অনিচ্ছুক মাতা যশোমতীর স্নেহাতুর মাতৃহৃদয়ের আকুলতা এবং গোপালের প্রতি তার অপরিসীম বাৎসল্য ইত্যাদির সুষ্ঠু অভিব্যক্তি দেখিয়া স্থানকাল ভুলিয়া যাইতে হয়।

হালামদের কথা

লুসাই পাহাড়ের পাদদেশে লঙ্গাই নামক এক জায়গায় আমি হালামদের সংস্পর্শে আসি, ইহারা পার্ব্বত্য টিপরা জাতির শাখা-বিশেষ। ইহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সবই অদ্ভুত। বর্ত্তমান-কালে বাঙালীদের সংস্রবে আসায় ইহারা কতকটা সভ্য হইয়াছে এবং নিজেদের প্রথাগুলি ক্রমশ পরিত্যাগ করিতেছে।

হালামরা ছোট ছোট পাহাড় বা টিলার উপর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। উঁচু বাঁশের মাচার উপর বাড়ীগুলি তৈয়ারি। ধাপ-কাটা গাছের গুঁড়িতে প্রস্তুত সিঁড়ি বাহিয়া ঘরের বারান্দায় উঠিতে হয়। ঘরের ছাদ বাঁশ ও একরকম পাতায় ছাওয়া। প্রত্যেক হালামের বাড়ীতে একখানা মাত্র ঘর থাকে। উহার একদিকে রন্ধনশালা এবং আর এক দিকে পরিবারস্থ সকলের শুইবার স্থান। মাচার নীচে শূকর কুক্কুট প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষীর আস্তানা।

হালাম-পুরুষেরা সকলেই ধুতি ও জামা পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা একখানা পাঁচ হাত ধুতি বুকের কাছে গেরো দিয়া পরে এবং আর একখানা ছোট চাদর কটিতে জড়াইয়া রাখে, কেউ কেউ লম্বা হাতাওয়ালা একরকম কোর্ত্তাও গায়ে দেয়। বয়স্কা নারীরা হাটে সওদা করিতে যাইবার কালে মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া থাকে।

অলঙ্কারের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ইহাদের কর্ণভূষণ। হালাম নারীদের এক এক কানে দুইটা করিয়া ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। কানের উপর দিককার ছিদ্রটি ছোট, কিন্তু তেলোর ছিদ্রটি মস্ত:

বড়। রূপা দস্তা অথবা টিনের তৈয়ারি একটা অলঙ্কার কানের উপরিভাগে পরানো থাকে, আর তেলোর ছিদ্রের ভিতর আন্দাজ দুই ইঞ্চি ব্যাসের একটা গোল রূপার চাকৃতি লটকানো থাকে। এই গহনার দরুন হালাম নারীদের কানগুলি ভারি বিশ্রী দেখায়। প্রত্যেক হালাম নারীই রূপার তৈরি এক প্রকার হার এবং কাঁচ, গিল্টি, কুঁচ ইত্যাদির মালা গলায় পরে। অবস্থাপন্ন নারীরা টাকা আধুলি এবং সিকিতে কোঁড়া বসাইয়া হাররূপে গলায় পরিয়া থাকে। বাহুতে কোনো গহনা পরিবার রেওয়াজ ইহাদের নাই। ইহারা কেশে এবং কর্ণভূষণে বনফুল পরিতে বড়ই ভালবাসে। যুবতীরা বনফুল দিয়া একে অপরের কেশবিন্যাস করিয়া দেয়। হালাম-পুরুষদের কানে পিতলের অঙ্গুরীয় এবং গলায় তুলসীর মালা।

হালাম স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সকলেই মদ্য এবং ধূমপানে আসক্ত। ইহাদের হুঁকাগুলি অদ্ভুত ধরণের। মোটা একটা বাঁশের চোঙের ফুটার মধ্যে সরু আর একটি চোঙ্গ বসানো থাকে। ঐ ছোট চোঙ্গটির উপর কলিকা বসাইয়া তাহারা ধূমপান করে।

ভাত পচাইয়া ইহারা মদ তৈয়ার করে। পালা করিয়া এক এক দিন এক এক বাড়ীতে মদ প্রস্তুত হয়। বাড়ীর উঠানের মধ্যে মদ্যপূর্ণ বড় বড় মৃৎপাত্র বসানো থাকে এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলে সেগুলার চারিদিকে মণ্ডলাকারে বসে ও একটা সরু বাঁশের নল মৃৎপাত্রের ভিতর ঢুকাইয়া মদ্যপান করে। মদ খাইবার সময় কথা বলা কিংবা বাঁ হাত দিয়া নল ছোঁয়া ইহারা মহা দূষণীয় বলিয়া মনে করে। কচি কচি ছেলে-মেয়েদের পর্য্যন্ত মদ চাখিতে এবং ধূমপান করিতে দেখা যায়।

শূকর এবং কুক্কুট-মাংস ইহাদের অতি প্রিয় খাদ্য। কলাগাছ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া বেত ও মরিচ-চূর্ণ সংযোগে ইহারা এক অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন রান্না করে। ইহারা কাঁচা মাংস মরিচ-চূর্ণের সহিত

ছেঁচিয়া এবং আগুনে পোড়াইয়া খাইতে খুব ভালবাসে। খাওয়ার পর কাহারও পাতে কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে পরিবেশনকারিণী তাহা তুলিয়া লইয়া যায় এবং অপরকে তাহা পরিবেশন করে। খাওয়া-দাওয়া চুকিলে একখানা কাপড় দিয়া উচ্ছিষ্ট ঝাড়িয়া মাচার নীচে ফেলিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে খাওয়ার পর আঁচাইবার রেওয়াজ নাই।

হালাম যুবক-যুবতীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা প্রচলিত আছে। বিবাহের আগেই তরুণ-তরুণীদের মধ্যে প্রণয় হইয়া থাকে। গভীর রজনীতে বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইলে পর প্রণয়ীরা নিজ নিজ প্রণয়িনীর সহিত দেখা করে। আগেকার দিনে হালাম যুবকেরা মাথায় দীর্ঘ কেশ রাখিত। তখন প্রণয়িনীরা বাঁশের কাঁকই দিয়া তাহাদের মাথার চুল আঁচড়াইয়া খোঁপা বাঁধিয়া দিত। বিবাহের আগে বরকে কনের বাপের বাড়ীতে পাঁচ বছর জন খাটিতে হয়। এই পাঁচ বছর বর-কনে স্বামী-স্ত্রীর মত একত্রে বাস করে। খাটুনির মিয়াদ ফুরাইলে বরের পিতা মদ্যসহ (কমপক্ষে বারো কলস) কনের পিতার বাড়ীতে আসিয়া হাজির হয়। সেখানে সকলে মিলিয়া মদ্যপান করে। মদ্য-পাত্রসমূহের নিকটে একটা থালার উপর কিছু তুলা বিছানো থাকে। কনের জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় ভাইয়েরা ইচ্ছামত টাকা, আধুলি সিকি ইত্যাদি ঐ থালার উপর রাখে—এ সমস্ত কনের প্রাপ্য। কনের বাপের বাড়ী হইতে বর-কনেকে এক সঙ্গে কনের মামার বাড়ীতে যাইয়া কিছুক্ষণ থাকিতে হয়। তারপর বরের বাপ বরকন্যাকে লইয়া বাড়ীতে চলিয়া আসে। বিবাহের পর তিন দিন পর্য্যন্ত কনের পক্ষের বাপের বাড়ীর কাহারও মুখদর্শন করা না কি মহাপাপ।

বর জন খাটিতে রাজী না হইলে কনের পিতাকে তাহার ষাট টাকা পণ দিতে হয়। মেয়ের অমত থাকিলে বাপ-মা জোরজবরদস্তি করিয়া

তাহার বিবাহ দিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে সময় সময় বিবাহচ্ছেদ হইয়া থাকে। পরস্পরের মনোমালিন্যের দরুন স্ত্রী যদি স্বামীর ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসে তাহা হইলে স্বামীর নিকট সে ষাট টাকা দাবি করিতে পারে।

অন্যান্য পাহাড়ী জাতির মত ইহারাও জুম কৃষি করে। প্রথমে পাহাড়ের উপরকার জঙ্গল পোড়াইয়া দা দিয়া মাটি কোপাইয়া হরেক রকম তরিতকারীর বীজ একসঙ্গে বপন করে। তারপর প্রথম বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই ধান্য রোপণ করে। ধান্য এবং কার্পাস ইহাদের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। পাহাড়ের উপর প্রত্যেকেরই এক একখানা করিয়া ছোট ঘর থাকে। সেগুলিতে তাহারা ধান্যাদি গোলাজাত করিয়া রাখে।

হালাম নারীরা খুব পরিশ্রমী। কৃষিকার্য্য হাট-বাজার ইত্যাদি বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকেরাই করে। ইহাদের মধ্যে 'জুমের গান' নামক এক শ্রেণীর সঙ্গীত প্রচলিত আছে। ক্ষেত্রে কাজ করিবার সময় স্ত্রীলোকেরা সুর করিয়া জুমের গান গাহিয়া থাকে।

পোশাক-পরিচ্ছদ কিংবা ঘর-গৃহস্থালির দরকারী আসবাবপত্রাদির জন্য ইহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। প্রত্যেক হালামের বাড়ীতেই চরকা ও তাঁত আছে। নিজেদের আবশ্যক বস্ত্রাদি হালাম-নারীরা নিজেরাই বুনিয়া থাকে। সূচীশিল্পেও ইহাদের বিশেষ দক্ষতা আছে। হালাম-নারীরা এক মুহূর্ত্তও আলস্যে অতিবাহিত করে না।

বাঁশ ইহাদের বিশেষ একটি দরকারী জিনিষ। বাঁশ হইতে বেত তুলিয়া তাহা দ্বারা ইহারা এক ধরণের টুক্‌রি তৈয়ারি করে। সেগুলিকে বলে 'চাম্পুই'। ওগুলিতে তরিতরকারী ভরিয়া লইয়া হালাম-নারীরা বাজারে বিক্রয় করিতে যায়। মাদুর, দোলনা, কাঁকই ইত্যাদি আরও নানা জিনিষ ইহারা বাঁশ দিয়া তৈয়ার করে।

প্রত্যেক হালাম বস্তিতেই একজন 'গালিম' বা গ্রামপ্রধান এবং তাহার একজন সহকারী থাকে। গালিমের সহকারীকে 'গাবুর' বলা হয়। গ্রামের লোকদের ছোটখাটো অপরাধের বিচার ইহারাই করিয়া থাকে। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সম্মতি ছাড়া কিন্তু ইহারা কাহাকেও দণ্ড দিতে পারে না। 'গালিম' ও 'গাবুর' কোনো সামাজিক অপরাধ করিলে গ্রামবাসীরা সকলে একমত হইয়া তাহাদের জরিমানা করিতে পারে।

হালামরা ভূতপ্রেত এবং উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। ইহাদের ভিতর কতকগুলি কুসংস্কার প্রচলিত আছে। কেহ রোগাক্রান্ত হইলে ইহারা মনে করে যে, লোকটির উপর ভূতের আবেশ হইয়াছে। তাই, ভূত ছাড়াইবার জন্য ওঝাকে ডাকাইয়া আনা হয়। ওঝাকে ইহারা 'অচাই' বলে। 'অচাই' আসিয়া রোগীর নাড়ী টিপিয়া বলে, তাহার উপর অমুক ভূতের আবেশ হইয়াছে এবং ভূত তাহার নিকট অমুক জিনিষ চাহিতেছে। 'অচাই'য়ের কথামত ভূতকে তাহার প্রার্থিত জিনিষ দেওয়া হয়, একবারে ফল না হইলে, তিন তিন বার ওরূপ করা হয়।

তিন বছর বয়সের সময় ছেলেমেয়েদের কর্ণবেধ করা হইয়া থাকে; কর্ণবেধের সময় গুরুজনেরা তাহাদিগকে চরকায় কাটা সুতা ও চাউল মাথায় দিয়া এবং মুখে একটু নুন দিয়া আশীর্ব্বাদ করে।

কেহ মরিলে পর ইহারা কতকগুলি ঝাঁজ বাজাইয়া প্রতিবেশীদিগকে জানায়। তখন প্রতিবেশীরা স্ত্রী-পুরুষ সকলে মৃতব্যক্তির বাড়ীতে আসিয়া জমায়েৎ হয়। মেয়েরা সকলেই আঁচল ভরিয়া ফুল লইয়া আসে। শবদেহটিকে গরম জলে স্নান করাইয়া রাখা হয় এবং দুইটি টাকা দিয়া তাহার দুই চোখ ও লাল রঙের সুতা দিয়া মুখের ছিদ্র ঢাকিয়া দেওয়া হয়; মেয়েরা সকলে মিলিয়া শবদেহটিকে ফুল দিয়া সাজায়

এবং নিজেরাও কানে ফুলের দুল পরে। বয়স্কা নারীরা বিড়বিড় করিয়া কতকগুলি কথা আওড়াইয়া মৃতদেহটির উপর পান-সুপারি রাখে, তারপর শবদেহটির নিকট প্রণতি করিয়া স্ত্রীপুরুষ পরস্পর পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলা ঝাজ ও ঢোলক বাজিতে থাকে এবং স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকা সকলে মিলিয়া মদ্যপান সুরু করে। নৃত্য শেষ হইলে একজন বয়স্কা নারী সকলের মাথায় কিছু কিছু তেল মাখাইয়া দেয়।

এই সমস্ত অনুষ্ঠান সমাধা হইলে শবদেহটিকে আপদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া আনা হয় এবং বাঁশের তৈরি সুন্দর শবাধারে স্থাপিত করিয়া দাহ করিবার জন্য নিবিড় জঙ্গলের ভিতর নদীতীরস্থ সৎকারভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়। স্ত্রীলোকেরা টুকরিতে করিয়া মদ্য, পুষ্প, ভাত, সিদ্ধ-করা কুক্কুটমাংস, কদলী, পান-সুপারি এবং একটি জীবন্ত কুক্কুটশাবক লইয়া শবের অনুগমন করে। দাহকার্য্য সমাধা হইলে মদ্য ও কুক্কুটমাংসাদি মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া সৎকারভূমিতে রাখিয়া কুক্কুটশাবকটিকে সে জায়গায় ছাড়িয়া দেওয়া হয় ও একটি গাছের ডাল মাটিতে পুঁতিয়া তাহাতে মৃতের 'চাম্পুই' এবং একটি পাখা বাঁধিয়া রাখা হয়। সৎকারান্তে বাড়ী ফিরিবার সময় সকলকেই একজাতীয় গাছের ডাল ভাঙিয়া বাঁ হাতে করিয়া লইতে হয়, শেষে একই জায়গায় সবাইকে সেগুলি ফেলিয়া দিতে হয়।

পরদিন মৃতব্যক্তির বাড়ীতে পূজা হয় এবং 'অচাই' তুলসীর জল ছিটাইয়া ঘর শুদ্ধ করে।

ইহাদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর মানুষ চিল কিংবা ঘুঘুপাখীর উপর চড়িয়া স্বর্গে যায় এবং সেখানে তার পাপ-পুণ্যের বিচার হয়।

কলেরা রোগে কাহারও মৃত্যু হইলে হালামরা তাহার মৃতদেহ দাহ করে না—কপালে আগুন ছোঁয়াইয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে।

ইহারা বহু দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে 'তুইরেংপা,' 'তুইহুংপা,' 'শিবরাই' প্রভৃতি প্রধান। তা' ছাড়া ভূতপ্রেত এবং উপদেবতাদির পূজাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, ভূতপ্রেতাদির পূজা উপলক্ষ্যে ইহারা শূকর বলি দেয়।

'খলাইরই' পূজা ইহাদের সকলের চেয়ে বড় পূজা। হালামরা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমভাগে এই পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের মতে অগ্রহায়ণ মাস বৎসরের প্রথম মাস।

বাড়ীর উঠানের মধ্যে খানিকটা জায়গা সাফ্ করিয়া লইয়া কতকগুলি বংশখণ্ড মাটিতে পুঁতিয়া সেগুলির গায়ে আড়াআড়িভাবে আরও কতকগুলি বংশখণ্ড বাঁধিয়া রাখা হয় এবং তদুপরি খানকতক তাঁতে-তৈরি কাপড় বিছাইয়া রাখা হয়। বাঁশগুলির গায়ে গুটিকতক সূক্ষ্মাগ্র মজ্জাপূর্ণ বংশখণ্ড হেলান দেওয়া থাকে। বাঁশগুলিকে ইহারা চাঁচিয়া ছুলিয়া খুব সুন্দর করিয়া রাখে। 'অচাই' ফুল-পাতা-বাঁধা একগাছি চরকায় কাটা লম্বা সুতা মাথায় জড়াইয়া বিড়-বিড় করিয়া মন্ত্র আওড়াইতে থাকে এবং এক একটি বাঁশ কাটিয়া ভিতরকার মদ মৃত্তিকায় প্রোথিত বংশখণ্ডগুলির উপর ঢালিয়া দেয়। 'অচাই'য়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন মাথায় সুতা বাঁধিয়া পূজাস্থানের নিকটে ঘুরিতে থাকে।

বংশখণ্ডগুলির সামনে একটি বৃক্ষপত্রে কিছু চাল রাখিয়া দেওয়া হয়, ইহাই তাহাদের নৈবেদ্য। 'অচাই' এই নৈবেদ্যের উপর কুক্কুট বলি দেয়। পূজা শেষ হইলে, চাল এবং কুক্কুটের রক্ত একত্র করিয়া মাখানো হয়। এই পূজা উপলক্ষ্যে আন্দাজ পঁচিশ-ত্রিশটা মোরগ বলি

দেওয়া হয়। পূজাস্থানের নিকটেই একটা কড়াইয়ে কুক্কুটগুলা সিদ্ধ হইতে থাকে।

বাহিরের অনুষ্ঠানাদি শেষ হইলে 'অচাই' দা-হাতে ঘরের ভিতরে আসিয়া ঢোকে। মেঝের উপর তণ্ডুলপূর্ণ একটি মৃৎপাত্র বসানো থাকে, এই পাত্রটির কাছে কিছু তুলাও বিছানো থাকে। এখানে কুক্কুটগুলিকে জবাই করা হয়। 'অচাই' প্রথমে কুক্কুটগুলির গলার অর্দ্ধেক কাটিয়া ফেলে, তারপর কুক্কুট-রক্ত দ্বারা তুলা ভিজাইয়া লয় এবং একটা পাত্রে খানিকটা রক্ত রাখিয়া দেয়। শেষে দা দিয়া কুক্কুটগুলির পেট ফুঁড়িয়া ভিতরে কিছু জল ঢালিয়া দেয় এবং নাড়ি-ভুঁড়ি টানিয়া বাহির করে।

এর পর দুইটি মদ্যপূর্ণ মৃৎপাত্রের সাম্‌নেও কুক্কুট জবাই করা হয়। তখন সকলে সার বাঁধিয়া বসে এবং একজন একটি বাঁশের চোঙ্ উপুড় করিয়া প্রত্যেকের হাতে একটু একটু মদ ঢালিয়া দেয়। ওই মদ প্রথমে মাথায় ঠেকাইয়া শেষে খাইতে হয়। অতঃপর সকলকে এক এক পাত্র মদ দেওয়া হয়। তখন সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠে 'চুবাই' 'চুবাই' (নমস্কার নমস্কার) এবং মদ্যপান সুরু করে। মদ খাওয়া শেষ হইলে একটি যুবতী সকলকে পান পরিবেশন করে।

যাহার বাড়ীতে পূজা সে সেইদিন গ্রামের লোকদের এক বিরাট্ ভোজ দেয়। দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়ার পর পুনরায় মদ্যপান সুরু হয় এবং পরদিন দুপুর রাত পর্য্যন্ত পুরাদমে মদ খাওয়া চলিতে থাকে।

পূজার পরদিন ইহাদের নাচিবার পালা। প্রথমে 'গালিম' মাথায় একটি পাগড়ি বাঁধিয়া বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাচিতে আরম্ভ করে। অপর দুই ব্যক্তি দুইটি বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে থাকে আর সকলে মিলিয়া বিষম হল্লা জুড়িয়া দেয়। গালিমের নৃত্য শেষ হইলে অচাইকে নাচিতে হয়।

অচাইয়ের সঙ্গে এক বুড়ী একখানা রঙিন কাপড় ওড়নার মত কাঁধের উপর ফেলিয়া নৃত্য করে। খলাইরই বা বার্ষিক পূজার সময় যুবতীদের নাচিবার রেওয়াজ নাই, কিন্তু অন্যান্য পূজা-পরব উপলক্ষ্যে তাহারা নৃত্য করিয়া থাকে।

প্রত্যেক হালাম বস্তিতে সার্ব্বজনীন পূজার জন্য নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটি ঘর থাকে। সেইটির নাম 'বারেইন'। সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া ঐ ঘর তৈয়ার করে। ফাল্গুন মাসে হালামরা 'বারেইনে'র চারিধারের জঙ্গল সাফ করে এবং ঘরের ভিটার মাটি কাটিয়া কতক-গুলি ঢিবি তৈরি করিয়া সেগুলির গায়ে তুলা আর চর্‌কায় কাটা সুতা বাঁধিয়া রাখে।

হালামদের সবগুলি পূজার অনুষ্ঠানাদি অবিকল একই ধরণের। তবে কোনো কোনো পূজায় একটু-আধটু ইতরবিশেষ যে নাই তেমন নহে। আজকাল হিন্দুদের অনেক পূজা-পদ্ধতি ইহারা গ্রহণ করিতেছে।

বড বা কাছাড়ী

"দরং, কামরূপ প্রভৃতি জেলায় যে একটি আদিম জাতি অসমীয়াদের নিকট কছাড়ী এবং বাঙালীদের নিকট কাছাড়ী নামে পরিচিত, তাহাদের আসল নাম বড জাতি। তাহাদের মধ্যে যে-ভাষা প্রচলিত, তাহারও নাম বড় বা বড ভাষা। আসাম-বেঙ্গল রেলপথে যাঁহারা লামডিং পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন ডাওতুহাজা, মাহুর, মাইবং :প্রভৃতি ষ্টেশনে কতকগুলি পাহাড়ী নরনারী ফলমূল বেচিতে আসে। পুরুষদের মাথায় দীর্ঘকেশ, কানে অনেকগুলা তামার আঙুটী পরানো, তাহাতে বনফুল গোঁজা। স্ত্রীলোকদের মাথার সাম্‌নের দিকটা কামানো, গলায় পশুর হাড়, পুঁতি, কড়ি প্রভৃতির মালা, পরনের অপ্রশস্ত নোংরা বস্ত্রখণ্ডটি দিয়া হাঁটু পর্য্যন্তও ঢাকা পড়ে না। কাছাড় জেলার পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রধানতঃ ইহাদের বাস। ইহারা নিজেদের ডিমাশা নামে পরিচয় দেয়। আসামের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অতীতে আহোমদের সঙ্গে লড়াইয়ে হারিয়া এক দল কাছাড়ী নিজেদের বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ অঞ্চলে ডিমাপুরে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করে। ডিমাশারা সেই দেশত্যাগী কাছাড়ীদেরই বংশধর। সমতলবাসীদের নিকট অবশ্য ইহারা বড়দের ন্যায় কাছাড়ী নামেই পরিচিত।" *

দরং জেলায় যে-সমস্ত বড় বা কাছাড়ী বাস করে, তাহাদের বস্তিগুলা বেজায় নোংরা, অপরিচ্ছন্ন। বাড়ীগুলি খুব ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে

* বিচিত্র মণিপুর পৃঃ ১, ২

অবস্থিত। প্রত্যেক কাছাড়ী গৃহস্থই অনেকগুলা শূকর এবং অন্যান্য পশু পোষে। ইহাদের মূত্রপুরীষের দুর্গন্ধে কাছাড়ী গ্রামসমূহ চব্বিশ ঘণ্টা ভরপুর থাকে। কাছাড়ীরা বাড়ির চতুষ্পার্শ্বে গভীর খাল খনন করিয়া তাহার পাড়ে ইকড় এবং বাঁশ দিয়া মজবুত বেড়া তৈয়ার করে। ইহারা প্রায় সকলেই গুটিপোকার চাষ করে। ইহাদের তাঁতগুলা খুব সাদাসিধা ধরণের। কাছাড়ী-গৃহিণী এবং পরিবারের বয়স্থা মেয়েরা গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে কাপড় বোনে। মেয়েরা অবসর সময়ের বেশীর ভাগই বস্ত্রবয়নে ব্যয়িত করে। অন্যান্য গৃহকর্ম্ম অবহেলা না করিয়াও তাহারা পারিবারিক আয়বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়। ধানের বীজও মেয়েরাই বুনিয়া থাকে।

কাছাড়ীরা নারীদের যথেষ্ট সম্মান করে, পরিবারে মাতা এবং জায়া গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিতা। কাছাড়ী পুরুষ নিজের স্ত্রীকে রীতিমত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, একথা বলিলে অতিশয়োক্তি করা হয় না। কি কুমারী অবস্থায়, কি বিবাহিত জীবনে, সকল সময়েই কাছাড়ী মেয়েরা প্রচুর স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা সাধারণতঃ এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে না। সতীত্বের মর্য্যাদাবোধ ইহাদের পুরামাত্রায়ই আছে। কাছাড়ীদের সামাজিক ব্যবস্থা অনুসারে নরনারী মাত্রেই সংযত জীবন যাপন করিতে বাধ্য। কাছাড়ী কুমার-কুমারীদের মধ্যে অবৈধ প্রণয়লীলার কথা যে কখনও শোনা যায় না তেমন নহে, কিন্তু তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি সঙ্গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। দৈবাৎ, তাহা জানাজানি হইয়া পড়িলে প্রণয়িযুগল সমাজের কলঙ্কস্বরূপ বিবেচিত হয় এবং তাহাদের লজ্জার অবধি থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে সমাজের মাতব্বরদের ব্যবস্থা অনুসারে ইহাদের পরস্পরকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়, কিন্তু ইহাতে মেয়েটির বাপমায়ের আপত্তি থাকিলে, তাহার

প্রেমাস্পদের নিকট হইতে কুড়ি হইতে পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা আদায় করা হয়। মেয়েটির গর্ভ উৎপন্ন হইলে কিন্তু ইহাদের পরস্পরকে পরিণীত হইতেই হয়।

কাছাড়ীদের অন্যতম জ্ঞাতি গারোরাও নারীর সতীত্বকে অতি উচ্চে স্থান দিয়া থাকে। আগেকার দিনে গারোদের সমাজে ব্যভিচারী নরনারীর জন্য যে কিরূপ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল তাহা ভাবিলে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়। সেকালে ব্যভিচারী গারো পুরুষকে হয় ক্রীতদাসরূপে বেচিয়া ফেলা হইত, নতুবা তাহাকে হত্যা করা হইত। ব্যাভিচারিণী নারীর কানের তেলো কাটিয়া ফেলা হইত, তাহার পোশাক-পরিচ্ছদ টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হইত, প্রতিবেশীদের ভর্ৎসনায় তাহার জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিত, এবং দ্বিতীয় বার অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইলে তাহার পক্ষে মৃত্যুদণ্ডের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব ছিল।

নাগা পাহাড়ে সেমা নাগা নামে একটি আদিম জাতি বাস করে। নৃতাত্ত্বিক ডক্টর হাটনের গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহারা নাগা পাহাড়ের বাসিন্দা আঙ্গামী, আও, লোটা রেঙ্গমা প্রভৃতি নাগাদের স্বজাতি নহে। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, সেমারা 'বড' জাতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং কাছাড়ী ও গারো এই উভয় জাতির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সেমা মেয়েরাও কাছাড়ীদের ন্যায় সতীত্বের মর্য্যাদাবোধ সম্বন্ধে সচেতন। ইহাদের প্রতিবেশী আও প্রভৃতি অন্যান্য নাগা-সম্প্রদায়ের নিকট সতীত্বের মূল্য তো এক কাণাকড়িও নহে। সমর্থ যুবতী অবিবাহিতা আও মেয়েরা রাত্রিবেলায় আলাদা একটি ঘরে তিন চার জনে একত্রে শয়ন করে। যুবকেরা মোরাং হইতে সেখানে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয়। প্রত্যেক মেয়েরই গণ্ডা গণ্ডা প্রণয়ী থাকে, বটে অবশ্য

একসঙ্গে সে একাধিক প্রণয়ীকে নিজের কাছে ঠাঁই দেয় না। এইরূপে যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবার ফল এই দাঁড়ায় যে, বিবাহিত জীবনেও বারবনিতাদের সঙ্গে ইহাদের বড়-একটা প্রভেদ থাকে না।

এই অবৈধ এবং অবাধ সংসর্গ কিন্তু ইহাদের নিকট দূষণীয় বলিয়া গণ্য নহে, এবং সেজন্য কোনো সামাজিক শাস্তির ব্যবস্থাও ইহাদের নাই। লোটা নাগাদের রীতিনীতি আলোচনা করিলে মনে হয় যে, দুনিয়ার বহু আদিম জাতির ন্যায় একদা ইহাদের সমাজেও যৌথ বিবাহ প্রচলিত ছিল। কোনো লোটা-পুরুষ যখন দিনকতকের জন্য বাটী হইতে অন্যত্র যায়, তখন সে তাহার ভাইদের তাহার অনুপস্থিতিকালে নিজ পত্নীর পতিত্ব করিবার অনুমতি দিয়া যায়। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর, তাহার বিধবা স্ত্রী তাহার ভাইয়ের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। রেঙ্গমা নাগাদের প্রথা ইহার চেয়েও খারাপ। কিন্তু সেমা নাগাদের মধ্যে অবৈধ সঙ্গম তো দূরের কথা "বিবাহের পূর্ব্বে কোনো যুবক কোনো যুবতীর গায়ে হাত দিলে পর্য্যন্ত তাহাকে জরিমানা দিতে হয়।" অবিবাহিতা সেমা মেয়েদের উপর কড়া নজর রাখা হয়। কাছাড়ীদের ন্যায় সেমা মেয়েরাও পিতার স্নেহ, স্বামীর ভালবাসা এবং ছেলেদের শ্রদ্ধাভক্তি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণেই পাইয়া থাকে। ভবিষ্যৎ জীবনে অধিকাংশ বালিকাই সুগৃহিণী ও সুমাতা বলিয়া পরিচিতা হয়। সেমারা বহু বিষয়ে প্রতিবেশী নাগাদিগকে অনুকরণ করিয়াছে, কিন্তু দাম্পত্য ব্যাপারে একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে নিজেদের জাতীয় মহান্ আদর্শ আজ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সুপথে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে।

অন্যান্য আদিম জাতির ন্যায় কাছাড়ীদেরও 'তিলগাছ' 'কুমড়া' 'বাঘ' প্রভৃতি বহু টটেম (Totem) আছে। তন্মধ্যে কেবলমাত্র বাঘ ছাড়া আর কোনো টটেমের প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শন করিবার রেওয়াজ তাহাদের মধ্যে নাই। কোথাও কোনো বাঘ মরিয়াছে জানিতে পারিলে 'মসা-আরই' বা ব্যাঘ্র-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লোকেরা এক জায়গায় জড়ো হইয়া মড়াকান্না জুড়িয়া দেয়। কান্নাকাটি শেষ হইলে ঘরের মেঝে প্রভৃতি গোবর ও কাদাজল দিয়া নিকাইয়া ফেলে এবং ব্যবহার-করা মাটির বাসন-কোসন ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিয়া দেয়। বাঘমহাশয়েরা কিন্তু তাহাদের জ্ঞাতিবর্গকে তিলমাত্রও খাতির করিয়া চলেন কিংবা বাগে পাইলে ঘাড় মটকাইতে কসুর করেন বলিয়া শোনা যায় না। পিতার মৃত্যুর পর বড় ছেলে সম্পত্তির ভার গ্রহণ করে। ছেলেরা সাবালক হইয়া বিবাহাদি করিলে পর, পরস্পরের মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়া আলাদা হইয়া যায়।

কাছাড়ীদের বিশ্বাস,—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য 'মোদাই' বা অদৃশ্য ভূতযোনি-সমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ। পাছে ভূতেরা তাহাদের অমঙ্গল ঘটায় এই ভয়ে তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত। কেহ পীড়িত হইলে ইহারা মনে করে যে, রোগগ্রস্ত লোকটির উপর 'মোদাই' ভর করিয়াছে। শূকর ছাগল ইত্যাদি বলি দিয়া মোদাইগুলাকে খোশ-মেজাজে রাখাই ইহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ।

ইহাদের দুই প্রকার দেবতা আছে,—(১) গৃহদেবতা (২) গ্রামদেবতা। ইহাদের প্রধান উপাস্য গৃহদেবতার নাম 'বাতাউ', 'সিজু' নামক বৃক্ষবিশেষ তাহার প্রতীক। কাছাড়ীদের গৃহ-প্রাঙ্গণে বেড়া-দিয়া ঘেরা সিজু গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। আধিব্যাধি এবং মড়ক

ইত্যাদি সর্ব্ববিধ দৈবদুর্ব্বিপাকের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে ছাগল, শূকর, মোরগ, কদলী, পান-সুপারি প্রভৃতি বিবিধ উপচারে বাতাউকে খুশী রাখা হয়। বাতাউর পত্নীর নাম 'মাইনাও'। ইনি হইতেছেন ধান্য-ক্ষেত্রের রক্ষাকর্ত্রী। মাইনাও ঠাকুরাণীর মুরগীর ডিমের উপর প্রবল আসক্তি এবং ঐ জিনিষটি তিনি কাছাড়ী ভক্তদের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণেই পাইয়া থাকেন। গারোরা সিজুগাছকে পূজা করে না বটে, কিন্তু গাছটিকে তাহারা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে। উহা তাহাদের নিকট 'শিশু' গাছ নামে পরিচিত। কাছাড়ীদের গ্রামদেবতাদের অধিকাংশই পৌরাণিক হিন্দু দেবদেবী; যথা—বুড়া মহাদেও (মহাদেব), জলকুবের, রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি। বৎসরে তিন বার ধান্যসংগ্রহের কালে ইহারা তিনটি বড় রকমের পূজানুষ্ঠান করিয়া থাকে। কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিলে উক্ত রোগের ভূতকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে তাহারা ধুমধাম সহকারে মরং পূজা নামে আর একটি পূজার আয়োজন করে। ইহাদের পূজাপর্ব্বের অনুষ্ঠানাদি দেউড়ি বা দেওধাইদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। দুর্ভিক্ষ মড়ক ইত্যাদির প্রাদুর্ভাবকালে কিন্তু, 'দেওধানী' নামক এক শ্রেণীর ভূতাবিষ্ট স্ত্রীলোকদ্বারা বিশেষ একটা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ওঝা বা ওঝাবুড়া নামক আর এক শ্রেণীর লোকেরা নাকি শঙ্খ, কড়ি প্রভৃতির সাহায্যে গণনা করিয়া ভবিষ্যতের শুভাশুভ বলিয়া দিতে পারে।

হিন্দুদের ন্যায় কাছাড়ী জননীরাও সন্তানের জন্মদান করিবার পর একমাস কিংবা দেড়মাস কাল 'অশুচি' থাকেন। অশৌচ অন্তে গায়ে 'শান্তিজল' ছিটাইয়া 'দেউড়ি' তাহাকে পরিশুদ্ধ করেন।

আগেকার দিনে প্রায়ই কাছাড়ী যুবকেরা মেয়েদের হরণ করিয়া

লইয়া গিয়া বিবাহ করিত। * আজকাল এই প্রথা একপ্রকার লোপ পাইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। এখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য যুবকেরা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া নিজেদের বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন করে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ছেলে যৌবনে পা দিবামাত্র বাপ তাহার জন্য পাত্রীনির্ব্বাচনে ব্যাপৃত হয়, পাকা দেখা হইয়া গেলে পর বিবাহের জন্য একটা শুভদিন অবধারিত করা হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে, বরপক্ষ নয় বোঝা খাদ্যদ্রব্য, ভারে ভারে পান-সুপারি, মদ্যপূর্ণ বড় বড় মাটির পাত্র এবং শূকর প্রভৃতি সহ কনের পিতার বাড়ীতে গিয়া হাজির হয়। অধিকাংশ স্থলেই বর তাহাদের সঙ্গে যায় না। বরপক্ষ কন্যার বাটীতে পৌঁছিবামাত্র কন্যাপক্ষীয়েরা তাহাদের উপর 'কাচুপানি' নামে একটা তরল পদার্থ ঢালিয়া দেয়। ফলে তাহাদের সমস্ত শরীর জ্বালা করিতে থাকে, এমন কি ফোস্‌কা পর্য্যন্ত পড়ে। এই মারাত্মক রসিকতাটুকু কিন্তু তাহাদিগকে নীরবে হজম করিতে হয়; মুখ ফুটিয়া আপত্তি প্রকাশ করা রীতিবিরুদ্ধ। এইরূপে বরপক্ষীয়েরা নাজেহাল হইলে পর 'পেটে খেলে পিঠে সয়' এই প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করা হয়। বর-পক্ষের যুবা-বৃদ্ধ সকলে সার বাঁধিয়া বসে এবং কন্যা সবাইকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করে, তারপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বিবাহিত জীবনের যাত্রা-পথে সমবেত জনমণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে। দিবসের অবশিষ্টাংশ হাসি-হল্লায় কাটিয়া যায়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কন্যাকে তাহার স্বামী-গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। বিবাহের যাবতীয় খরচ বরের বাপকেই বহন করিতে হয়, তাহাকে ৪০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত কন্যাপণ বা 'গা-ধন'

* মোরাণরা এখনও এপ্রিল মাসের বিহু পরবের সময় নিজ নিজ মনোনীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করে।

(কথাটা অসমীয়া ভাষা হইতে ধার করা, মানে ‘দেহের মূল্য’) দিতে হয়। বরের পিতার ‘গা-ধন’ দিবার সঙ্গতি না থাকিলে প্রতিপণ স্বরূপ বরকে শ্বশুরালয়ে জন খাটিতে হয়। কেহ যদি নিজ পরিবারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া শ্বশুরের পরিবারভুক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর মৃত্যুর পর সে এবং তাহার স্ত্রী, তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হয়। এণ্ড্‌ল সাহেব বলেন, আগেকার দিনে কাছাড়ীদের সমাজে গোত্রান্তর-বিবাহ (exogamy) নিষিদ্ধ ছিল। আসাম গবর্ণমেণ্টের জাতি-তত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর মেজর গার্ডন একথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। যাই হোক্, বর্ত্তমান কালে যার যে গোত্রে খুশি বিবাহ করিতে পারে। মৃতদার ব্যক্তি স্বীয় পত্নীর ছোট বোনকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু জ্যেষ্ঠা শ্যালিকাকে সে মাতৃবৎ জ্ঞান করিতে বাধ্য। সাধারণতঃ ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত নাই, কিন্তু প্রথমা পত্নীর গর্ভে সন্তান না জন্মিলে কাছাড়ীরা কখনও কখনও দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে।

মৃতদেহকে গোর দেওয়া এবং সৎকার করা—এই উভয় প্রথাই ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। দুইটিরই আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি অনেকটা একই ধরণের। অধিকাংশ স্থলেই অবস্থাপন্ন কাছাড়ীদের মৃতদেহ দাহ করা হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ কেহ মরিলে পর তাহার মৃতদেহকে সমাহিত করিবার উদ্দেশ্যে নদীতীরে বহিয়া লইয়া যাওয়া হয়। স্ত্রীলোকদের শবানুগমন করা নিষিদ্ধ। দাহ-স্থানে পৌঁছিয়া সেখানকার অধিষ্ঠাতা অপদেবতার নিকট হইতে ভূমিখণ্ড কিনিবার উদ্দেশ্যে মাটির উপরে কয়েকটি পয়সা ছড়ানো হয় এবং মৃতদেহকে মাটিতে রাখিয়া কবর খনন করা হয়। তারপর মৃতের আত্মীয়-কুটুম্ব এবং অন্যান্য শবযাত্রীরা একটি

শোভাযাত্রা গঠন করিয়া শবদেহ পরিক্রমণ করে। পুরুষদের বেলায় পাঁচবার এবং মেয়েদের বেলায় সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়। শব-পরিক্রমা সমাধা হইলে মৃতদেহকে কবরে পুরা হয়, এবং মৃতের নিকটাত্মীয়েরা মাটি চাপা দেয়। অন্য লোকের আত্মা যাহাতে মৃতের বিশ্রামের ব্যাঘাত জন্মাইতে না পারে, সেজন্য সমাধির চারি কোণায় চারিটি খুঁটি গাড়িয়া সেগুলিকে সুতা দিয়া বেষ্টন করা হয়। কবরে টাকা পয়সা ইত্যাদি পুঁতিয়া রাখারও রেওয়াজ আছে। সর্ব্বশেষে রৌদ্রবৃষ্টির কবল হইতে মৃতের আত্মাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সেখানে একটি চালাঘর তৈয়ার করা হয়। সেমারাও মৃতদেহকে সমাহিত করিয়া কবরের জায়গায় ছোট ঘর তৈরি করে।

'মিথাম গা-ধন-জানাই' 'মহু হা নাই' প্রভৃতি দু-একটি মাত্র ইহাদের নিজস্ব জাতীয় পাল-পার্ব্বণ আছে। অসমীয়া হিন্দুদের অনুকরণে ইহারা জানুয়ারি মাসে একবার এবং এপ্রিল মাসে আর একবার 'বিহু' উৎসব প্রতিপালন করে। জানুয়ারি মাসের উৎসব সাধারণতঃ বারোই তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের কয়েক সপ্তাহ আগে হইতেই যুবকেরা কতকগুলি খোড়োঘর নির্ম্মাণে রত হয় এবং গুটিকতক লম্বা বাঁশ মাটিতে পুঁতিয়া সেগুলার চারিপাশে শুকনো ঘাস এবং খড় ইত্যাদি জড়ো করিয়া রাখে, উৎসব-রাত্রে এগুলাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। ইহার সঙ্গে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পূর্ব্ববঙ্গে অনুষ্ঠিত 'ভেড়া-ঘর-পোড়া' উৎসবের সাদৃশ্য আছে। এপ্রিলের 'বিহু' পরবের প্রথম দিনে অসমীয়াদের প্রথামত গরুগুলাকে নিকটবর্ত্তী নদী কিংবা পুষ্করিণীতে লইয়া গিয়া স্নান করানো হয়, এপ্রিলের উৎসব সাতদিন ব্যাপিয়া চলে। এই সপ্তাহকাল কাছাড়ীরা নাচ-গান আমোদ-প্রমোদ মদ্যপান ইত্যাদিতে একেবারে মাতিয়া উঠে, কেবলমাত্র এই

সময়েই তাহাদের কঠোর সংযমের বাঁধন প্রকাশ্যভাবেই একটু আল্‌গা হইয়া যায়। সমতলের গারোরা দুইটি বিহুই প্রতিপালন করে। ডিমাসারা কেবলমাত্র একটি 'বিহু' উদ্‌যাপিত করে।

বড জাতির প্রাচীন ইতিহাস

বড জাতি বর্ত্তমান কালে অখ্যাত এবং অবজ্ঞাত হইলেও ইহাদের অতীত ইতিহাস গৌরব-মণ্ডিত। একদা আসাম প্রদেশ এবং উত্তর-পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থান বড জাতির অধিকারভুক্ত ছিল। সমগ্র বড জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোচ এবং কাছাড়ীরাই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে নরনারায়ণের রাজত্বকালে কোচজাতি গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। নরনারায়ণের ভ্রাতা শিলারায় ছিলেন সারা উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের সমকালিক বীর সেনানায়কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আজও কাছাড়ীরা অন্যতম গ্রামদেবতারূপে তাহাদের সেই জাতীয় মহাবীরের পূজা করিয়াথাকে। কামাখ্যার মাতৃমন্দির, হাজোর হয়গ্রীব মাধবের মন্দির প্রভৃতি কোচ-রাজাদের বহু কীর্ত্তিচিহ্ন কামরূপে এখনও বিদ্যমান।

১২২৮ খৃষ্টাব্দে আহোমরা পাতকোই পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক আসামে প্রবেশ করিয়াই উক্ত পর্ব্বতের পাদদেশস্থ ভূখণ্ডের অধীশ্বর মোরাণ এবং বরাহীদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের বাসিন্দা চুটীয়াদের সহিত যুঝিতে আরম্ভ করিল। প্রায় দেড়-শ কিংবা দুই শত বৎসর কাল ইহারা আমোহদিগকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে ইহারা হারিয়া গেল। অতঃপর পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া আহোমরা কাছাড়ীদের সহিত লড়িতে আরম্ভ করিল (১৪৮৮ খৃঃ), কিন্তু চুটীয়া

প্রভৃতির ন্যায় কাছাড়ীদেরও দুর্দ্দিন তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। প্রাণ-পণ চেষ্টা করিয়াও তাহারা আহোমদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। 'পরাজিত কাছাড়ীদের মধ্যে একদল তখন ধনশিরি নদী-তীরস্থ ডিমাপুরে আসিয়া নূতন রাজধানী স্থাপন করিল। ডিমাপুরের 'নামবার' জঙ্গলে এই দেশত্যাগী কাছাড়ীদেরই রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।' *

আসামের ইতিহাস-লেখক গেট সাহেব অনুমান করেন যে, কাছাড়ীরা তখন হিন্দু-প্রভাব হইতে সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত ছিল। কাছাড়ীরা যে তৎকালে আহোমদের চেয়ে উন্নত জাতি ছিল, ডিমাপুরের ভগ্নাবশেষ তাহার অন্যতম প্রমাণ। তখনকার দিনে আহোমরা কাছাড়ীদের ন্যায় ইট দিয়া দালান তৈরি করিতে জানিত না।

বড জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম ও আচার-অনুশাসনের প্রভাব

আর্য্যগণ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতকে আসামে প্রবেশ করেন। কালক্রমে আসাম প্রদেশটি তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মের লীলাভূমিতে পরিণত হয়। কাছাড়ীদের জ্ঞাতি চুটিয়ারা যে ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বেই তান্ত্রিক হিন্দু-ধর্ম্মের প্রভাবে আসে তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। ইহারা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই বিভিন্ন মূর্ত্তিতে কালীপূজা করিত এবং অসমীয়াদের ন্যায় কালীমন্দিরে নরবলি দিত। প্রায় চারি শতাব্দী হইল বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া মহাপুরুষ শঙ্করদেব আসাম প্রদেশটিকে বীভৎস তান্ত্রিকতার হাত হইতে উদ্ধার করেন। অসমীয়াদের দেখাদেখি হিন্দু চুটিয়ারাও তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন

* বিচিত্র মণিপুর পৃঃ ১, ২।

করে। বর্ত্তমানকালে, কেবলমাত্র দেউড়ি এবং বরাহী চুটিয়ারা কিয়ৎ-পরিমাণে তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। দরং জেলার বহু স্থানে 'কছাড়ী গাঁও' নামে কতকগুলি বস্তি আছে। সেই সমস্ত বস্তির আদিবাসী লোকেরা পুরাপুরি হিন্দু বনিয়া গিয়াছে। কাছাড়ীদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা দিন দিনই বাড়িতেছে। রাভারা বলে যে তাহাদের আদি-পুরুষ ছিলেন হিন্দু। তিনি নাকি একটি কাছাড়ী রমণীকে বিবাহ করিয়া জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। রাভারা অহিন্দু কাছাড়ীদের হাতে খায় না। কাছাড়ীদের কিন্তু রাভাদের স্পৃষ্ট অন্ন খাইতে আপত্তি নাই। পাতি প্রভৃতি ইহাদের কোনো কোনো উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকেদের শাক্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। মোরাণদের মধ্যে প্রায় সকলেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী, ইহারা নিজেদের জ্ঞাতি কাছাড়ীদের সহিত কুটুম্বিতার কথা অস্বীকার করে। ইহারা গো-মাংস কিংবা শূকর-মাংস খায় না এবং মদ্যপান করে না বটে, কিন্তু কুক্কুট-মাংস এবং মাছ ও কচ্ছপে ইহাদের অরুচি নাই। ইহারা মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র-সংযোগে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকে। গারোপাহাড়ের অন্যতম আদিবাসী হাইজং বা হাজংদের মধ্যে পরমার্থী এবং ব্যভিচারী নামে দুইটি হিন্দুসম্প্রদায় বিদ্যমান। পরমার্থীরা বৈষ্ণব এবং ব্যভিচারীরা শাক্ত। মোরাণদের ন্যায় পরমার্থী-সম্প্রদায়ও শূকরাদির মাংস খায় না এবং মদ্যপান করে না। ব্যভিচারীরা কিন্তু প্রতিবেশী গারোদের ন্যায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যথেচ্ছাচার চালায়। হিন্দুদের সহিত মেলামেশার দরুণ হাইজংরা আজকাল বিধবা-বিবাহের উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচারকার্য্য

আদিম জাতিদের মধ্যে হিন্দুপ্রভাবের এই সমস্ত বিবরণ পাঠ করিলে, হিন্দুমাত্রেরই মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠা স্বাভাবিক। কিন্তু, তাই

বলিয়া এ-কথাটা ভুলিলে চলিবে না যে, এ বিষয়ে হিন্দু জাতির কোনই কৃতিত্ব নাই। অসমীয়া হিন্দুগণ তাঁহাদের প্রতিবেশী এই সমস্ত আদিম জাতিকে 'মহাপুরুষীয়া' বৈষ্ণবধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দিবার জন্য অণুমাত্র চেষ্টাও তো আজ পর্য্যন্ত করেন নাই। চুটিয়া, মোরাণ, হাইজং প্রভৃতি নিজেরাই অগ্রণী হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং হিন্দু রীতি-নীতি একটু-আধটু গ্রহণ করিয়াছে। কাছাড়ীদের জ্ঞাতি, যে-সমস্ত আদিম জাতিকে হিন্দু-সমাজের সংস্রব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম দ্রুত প্রসারলাভ করিয়াছে। প্রায় ছয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ফুলার সাহেব গারোদের সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি লেখেন—"Garo villages are pretty numerous that have entirely become Christian. The missionaries are influencing very greatly the future development of the race. (J. B. Fuller : Preface to 'The Garos' by Playfair, p. xvi.)। অর্থাৎ—"গারো পাহাড়ের বহু গ্রামের সমুদয় অধিবাসী খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে। মিশনারীরা এই জাতিটির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে।" ইতিমধ্যে 'সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার' হইতে আগত 'মিসু' মহাশয়েরা গোটা গারো জাতিটাকেই 'প্রভু যীশুকে প্রেম করিতে' শিখাইয়াছেন। যীশুর প্রতি কতটা জানি না, কিন্তু 'মিসু'দের প্রতি অনুরাগ যে তাহাদের দিন দিন বাড়িতেছে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাহা বলিতে পারি। কিন্তু মিশনারীদের কার্য্যক্ষেত্র তো কেবল গারোদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। পরলোকগত এণ্ডল্ প্রভৃতির চেষ্টায় বহু কাছাড়ী নরনারী জাতীয় ধর্ম্ম এবং রীতিনীতির উপর বীতস্পৃহ হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। অথচ অবস্থা এমনি অনুকূল ছিল যে, হিন্দুরা একটু মনোযোগী হইলে মণিপুরীদের ন্যায় অধিকাংশ কাছাড়ী নরনারীকে হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়া ফেলা মোটেই কঠিন হইত না।

দলমা অভিযাত্রী

আসামে ভ্রমণ-পর্ব্ব শেষ করিয়া সিংভূমে বেড়াইতে গিয়া সেখানকার গহন অরণ্যেও আমি কোনো কোনো আদিম জাতির সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলাম। ইহারাও আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী। সভ্য-জগতের সংস্রব হইতে দূরে নিজেদের আদিম রীতি-নীতি এবং সংস্কারাদি লইয়া বাস করিতেছে। আদিবাসী হইলেও ইহারা আসামের খাসিয়া মিকির প্রভৃতির সগোত্র নহে। ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি আচার-ব্যবহার রীতিনীতি সবই আসামের আদিমজাতি সমূহ হইতে পৃথক। ইহাদিগকে ভালো করিয়া জানিবার জন্য সিংভূমের শালবনের ভিতর দিয়া দীর্ঘপথ আমি পদব্রজে পর্য্যটন করিয়াছি, নাচুপ প্রভৃতি কোনো কোনো গ্রামে 'হো'দের পল্লীতে আমাকে রাত্রি-যাপন করিতে হইয়াছে। অভ্রখনির সন্ধানে যেমন খাসিয়া পাহাড়ের পাড়ু নামক স্থানে গিয়াছিলাম, তেমনি বাদাম পাহাড়ের লৌহখনি আর রাখা মাইন্‌সের তাম্রখনি দেখিবার জন্য পায়ে হাঁটিয়া দীর্ঘ অরণ্যপথ অতিক্রম করিয়াছি। সিংভূমে ভ্রমণ কালে সেখানকার আরণ্য প্রকৃতি এবং অরণ্যচারী অপরিচিত নরনারী সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলাম এবার তাহা বর্ণনা করিব।

পাহাড়-জঙ্গলে কিছুকাল ঘোরাঘুরি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বিশ্রাম লাভার্থ অবশেষে আসিয়া আশ্রয় নিলাম জামশেদপুরের প্রান্ত-সীমায় এক নিভৃত স্থানে। জায়গাটি রমণীয়। পেছনে বিস্তীর্ণ বালু-শয্যার প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত ক্ষীণতোয়া খড়্‌কাই নদীর ওপারে শালবনের সবুজ সমারোহ, সম্মুখে দিগন্তস্পর্শী দল্‌মা পাহাড়ের নীল মায়া। পাহাড়ের উপরকার ঘন বনের নিবিড়তার ভিতর দিয়া পাহাড়ীদের পায়ে

চলার আঁকাবাঁকা পথ যেন কোন সুদূর রহস্য-লোকের অভিমুখে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। ঐ পথ-রেখার পানে তাকাইয়া তাকাইয়া ঘরের মায়ার চেয়ে পথের আকর্ষণই প্রবল হইয়া উঠে।
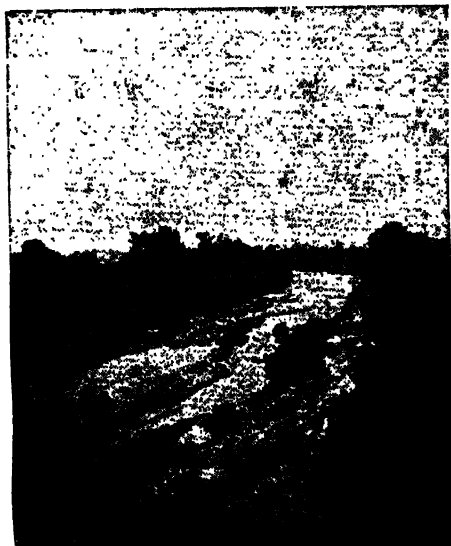
দলমা পাহাড়ের একটি দৃশ্য

একদিন শেষ রাত্রে অজানা পথেই বাহির হইয়া পড়িলাম দল্‌মা অভিযানে। পাহাড় দেশের কনকনে শীত যেন হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপন ধরাইয়া দিয়াছে। রাত্রিশেষের তরল অন্ধকারে আবৃত বিরাট্ লৌহ-নগরী যেন ঘুমন্ত দৈত্য-পুরীর মত রহস্যময়। যন্ত্রপুরী অতিক্রম করিয়া অবশেষে চলিতে লাগিলাম সুবর্ণরেখার পাড় ধরিয়া। গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর চেয়ে পথচলার আনন্দই ছিল প্রবল। সেজন্য পথের খুঁটি-নাটি সন্ধান নেওয়ার প্রয়োজন বোধ

করি নাই। সাঁকোর উপর দিয়া সুবর্ণরেখা পার হইয়া আসিয়া একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইলাম। কারখানার ধূমকলঙ্কিত আকাশে অরুণোদয়ের আরক্ত মহিমা।

পশ্চিমাভিমুখী একটা রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে আসিয়া প্রবেশ করিলাম এক গভীর অরণ্যে। সর্পিল অরণ্য-পথ বাহিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুদূর গিয়া দেখি রাস্তাটি উপরে না উঠিয়া ক্রমশঃ নীচে নামিতেছে। উৎরাই পথে ক্রমাবরোহণ করিতে করিতে অবশেষে আসিয়া পৌঁছিলাম উন্মুক্ত প্রান্তরে, এক আরণ্য জনপদে। দক্ষিণে দিগন্তপ্রসারিত ধানের ক্ষেত, উত্তরে অনতি-উচ্চ মালভূমি, মাঝখানে ছবির মত আদিবাসীদের এই পল্লীটি। মেয়েরা মাটির কলসী কাঁকালে নিয়া রওনা হইয়াছে ঝরণাতলার দিকে। পরনে তাদের চওড়া লালপাড় শাড়ি, হাতে কয়েকগাছি চওড়া সাদা শাঁখা, পায়ে রূপার খাড়ু, গলায় লাল ফিতা ঝুলানো। মাথায় এলো খোঁপা। কুচকুচে কালো চুলে টকটকে লাল ফুল গোঁজা। গতি তাদের ছন্দময়, চোখে আদিম বিস্ময়। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ আর মেয়েদের সহজ সরল চাহনি 'মেঘদূতে'র ভ্রূবিলাসনভিজ্ঞা, প্রীতিস্নিগ্ধ-লোচনা জনপদবধূদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় ; মনে পড়ে মেঘের প্রতি যক্ষের উক্তি—

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ
সদ্য সীরোৎকষণ সুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ।

দক্ষিণ ভারতের পার্ব্বত্য অঞ্চলের কোন্ জনপদবাসিনীদের ভ্রূ-লীলা-বিহীন স্নিগ্ধ দৃষ্টি মহাকবির কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ?

পথের পাশেই আদিবাসীদের সারি সারি দোচালা ঘর। ঘর-দোর সযত্নে নিকানো-পুছানো—তৈজসপত্র মাজা-ঘষা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে। সব কিছুতেই সুমার্জ্জিত পরিচ্ছন্নতা—প্রতিটী গৃহসংলগ্ন সযত্নরচিত পুষ্পোদ্যানে সহজাত সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার পরিচয়, গেরিমাটি দিয়া লেপা গৃহ-প্রাচীরে অঙ্কিত গাছ-পালা লতা-পাতার ছবিতে আদিম শিল্প-

দলমা পাহাড়ের পথে
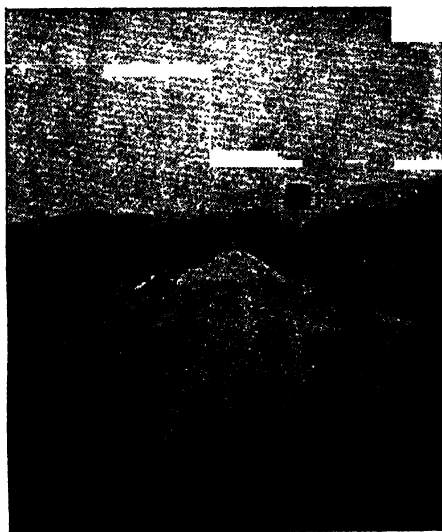
কলার প্রতিরূপ। মেয়ে-পুরুষ সকলেরই হাসি-খুশী মুখ দেখিয়া মনে হয়, এদের জীবনে দুঃখ-দৈন্যের লেশ নাই। প্রতিগৃহে নিটোল স্বাস্থ্য আর অনাবিল আনন্দের প্রতিচ্ছবি। স্নিগ্ধ প্রভাতে আরণ্য প্রকৃতির পটভূমিকায় আদিবাসীদের স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার এই আনন্দ-মনকে মুগ্ধ করিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মানস-পটে ভাসিয়া

উঠিল দিনকতক আগে ডিমনার পথ দেখা আর একটি দৃশ্য। সেদিন দেখিয়াছিলাম, কারখানার ভোরের সিটি বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে পাহাড়ীরা রওনা হইয়াছে লৌহ-নগরী জামশেদপুরের দিকে। সে যেন চলন্ত কঙ্কালের এক বিরাট্ মিছিল। কারখানার হাড়ভাঙ্গা

জনৈক হো

খাটুনি তাদের জীবনীশক্তিকে তিলে তিলে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। দল্‌মার পথের এই বনচারীদের পল্লীতে কিন্তু, যন্ত্রপুরীর সর্ব্বনাশা

বাঁশীর সুরে এখনো পৌঁছায় নাই। তাই তারা নিটোল স্বাস্থ্য আর খুশীভরা মন লইয়া জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতেছে; কিন্তু মানুষ যেভাবে নির্ম্মম-হস্তে সিংভূমের অরণ্যকে নির্ম্মূল করিতে সুরু করিয়াছে, তাহাতে দলমার পথের এই অরণ্যচারীরাও যন্ত্রদানবের সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষার হাত হইতে আর বেশীদিন রেহাই পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

খানিক বিশ্রামান্তে আবার সুরু হইল পথ-চলা। কে যেন দুই চোখে মায়া-অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে। রাস্তার দু'পাশে যা কিছু দেখিতেছি তাই ভালো লাগিতেছে। প্রকৃতিকে উপভোগ করিবারও বিশেষ একটা 'মুড' আছে। অজানা পথে একলা বাহির হইলেই যেন সে 'মুড'কে বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। পাহাড়-তলীতে গরু মহিষ ছাগল ভেড়া ইত্যাদি চরিয়া বেড়াইতেছে, কুচকুচে কালো মেষের উপর মিশকালো পাহাড়ী ছেলে নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়া আছে, পরস্পরের গলা জড়াজড়ি করিয়া, মেঠো পথের উপর দিয়া মিঠে সুরে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে পাহাড়ী তরুণীর দল। একটা তারের যন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরি চুলওয়ালা একটা লোক। এমনি কত বিচিত্র ছবির স্রোত যেন চোখের সামনে দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। নতুন ছবির বই দেখিয়া ছেলেদের মনে যে রকম আনন্দ হয়, তেমনি খুশিতে মন ভরিয়া আছে।

বনপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া চাণ্ডিল নামক এক বস্তিতে পৌঁছিয়া দলমার পথনির্দ্দেশক একটি সাইন-বোর্ডের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ডানদিকে অনতিদূরে জঙ্গলের ভিতর মরা ডাল আর শুকনো পাতায় ছাওয়া একটা কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া কয়েকজন পাহাড়িয়া 'হাড়িয়া'

(ধেনো মদ) পান করিতেছে। বখ্‌শিশ কবুল করায় এক ব্যক্তি আমাকে সঙ্গে করিয়া দলমায় লইয়া যাইতে রাজী হইল। লোকটি উলঙ্গপ্রায়, নাম তার চরণ—কাজ-চলা-গোছের বাংলা বলিতে পারে। তাহার প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, দলমা পাহাড়ের শিখর-দেশে অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে এক শিবলিঙ্গ।

হাতে তীর-ধনু, পিঠে একটা বোঁচকা—চরণ চলিয়াছে আগে আগে, তার পিছনে পিছনে মুগ্ধ বিস্ময়ে বন-পথের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিয়াছি আমি। সমস্ত অন্তর অজানা অচেনা দুর্গম পথে অভিযানের আনন্দে ভরপুর। রাস্তার দু'ধারে পিয়াল, কুসুম, শাল, মহুয়া, আমলকী, বুনোকুল এবং কত নাম-না-জানা বনস্পতির নিবিড় অরণ্য। অরণ্যভূমি বন্যদের ধাত্রীদেবতা। অরণ্যের স্নেহক্রোড়ে প্রতিপালিত তারা। চরণও অরণ্যমাতৃক দেশের লোক, আরণ্য বৃক্ষের সঙ্গে তার আশৈশব মিতালি। কোন্ গাছের শাখায় কখন ফুল ফোটে ফল ধরে, কোন্ গাছ হইতে মদ তৈরি হয়, এসমস্ত তাহার নখ-দর্পণে। গাছপালার প্রতি আমার প্রীতির পরিচয় পাইয়া, আর সেগুলির নাম জানিবার আগ্রহ দেখিয়া চরণের ভারি আনন্দ। বনের ভিতর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলে—"ঐ যে দেখ্‌ছিস মস্ত উঁচু গাছে বেগ্‌নি ফুল ফুটে আছে, সি কোড়ল ফুল বটেক।"

কোড়ল ফুলের গন্ধামোদিত চড়াই পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপর একটা ফাঁকা জায়গায় আসিয়া পৌছিলাম। চোখের সম্মুখ হইতে বনলক্ষ্মীর শ্যামাঞ্চলখানা অপসারিত হইবামাত্রই উদ্‌ঘাটিত হইল এক বিচিত্র দৃশ্যপট। বাঁদিকে খদের ওপারে অভ্রভেদী একটি পাহাড় অর্দ্ধবৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, গিরি-পাদমূলে হেমন্তের পক্ক ধান্যে পরিপূর্ণ স্বর্ণ-শীর্ষ শস্যক্ষেত্র। ধরিত্রী যেন মুঠা মুঠা স্বর্ণাঞ্জলিদ্বারা শৈলে-পাদার্চ্চনে রত। দক্ষিণে

অনতিদূরে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে নিরবচ্ছিন্ন শ্যামল বনশ্রেণী ক্রমনিম্নভাবে একেবারে সমতল ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রসারিত। স্বর্গ হইতে সবুজের বন্যা যেন বিপুল স্রোতে নামিয়া আসিয়াছে ধরণীর বুকে।

বেলা দশটা নাগাদ মেদিনীপুর জমিদারী কাছারির খাস জঙ্গলে

আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি, সিংভূমের আদিবাসী রমণী

আসিয়া পৌঁছিলাম। এইখান থেকে দু'ধারে বহুদূর-বিস্তৃত ছেদহীন ঘনবনের ভিতর দিয়া বন-লক্ষ্মীর সিঁদুর-মাখানো সিঁথি রেখার মত রাঙা মাটির পথ ক্রমোচ্চভাবে চলিয়া গিয়াছে গিরি-চূড়ার অভিমুখে। এখানকার অনন্তপ্রসারিত অরণ্যের স্তব্ধ-গম্ভীর বিরাট্ রূপ হৃদয়কে যেন নির্ব্বাক

বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিল। সমস্ত আরণ্য প্রাকৃতিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে এক সুগভীর নিস্তব্ধতা। বনের ভিতরে মাঝে মাঝে দীর্ঘায়িত ঘণ্টাধ্বনির মত নাম-না-জানা পাখীর ডাক, ক্বচিৎ উড়ন্ত পাখীর পক্ষ-বিধুনন শব্দ, মৃদু বাতাসে পত্রের মর্ম্মর এমনি বিচিত্র-মধুর ধ্বনি-সংঘাত অতলস্পর্শ নীরবতার সমুদ্রে ক্ষণিকের জন্য আলোড়ন তুলিয়া আবার তাহাতে বিলীন হইয়া যাইতেছে। মনে জাগিতেছে, রূপরস-শব্দ-স্পর্শ-বর্ণগন্ধময়ী প্রকৃতির অন্তরালস্থিত কোন্ এক চৈতন্যময় সত্তার দিব্যানুভূতি। আমার সমস্ত চেতনা যেন নৈঃশব্দ্যের সমুদ্রে অবগাহন করিয়া এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসাস্বাদন করিতেছে।

চলিয়াছি যেন রোমান্সে-ভরা, অজানা অচেনা এক রহস্য-লোকের ভিতর দিয়া। অরণ্যের ভাষাহীন বাণী যেন রক্তে দোলা দেয়, চেতনায় জাগিয়া উঠে প্রকৃতির সঙ্গে যুগ-যুগান্তরের একাত্মতার অস্ফুট আভাস। রাস্তার দু'ধারে খদের গভীরতম তলদেশ হইতে সরল, সমুন্নত ঘনসবুজ পত্রসমাচ্ছন্ন বনস্পতিসমূহ উঠিয়াছে ঊর্দ্ধপানে আলোর প্রত্যাশায়, অনন্ত-যৌবনা ধরণীর উচ্ছ্বসিত প্রাণপ্রাচুর্য্যের পরিচয়-পত্র বহন করিয়া। সৃষ্টির আদিম রহস্য যেন ঐ তরুশ্রেণীর ঘনান্ধকারে পুঞ্জীভূত। অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া শৈলসানুদেশে আসিয়া দেখি, পাহাড়ের গায়ে যেন রঙের আগুন ধরিয়া গিয়াছে। সুদূরপ্রসারিত আধিত্যকার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত হলদে রঙের পুষ্পসমাচ্ছন্ন এক জাতীয় গুল্মবৃক্ষে পরিপূর্ণ। পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবক শাখা আর পত্রগুচ্ছকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ঐ বন-কুসুমের বর্ণ-বৈভবের পানে তাকাইয়া চোখে রঙের নেশা ধরিয়া যায়। অধিত্যকা প্লাবিত করিয়া গড়ানে গিরি-গাত্রের উপর দিয়া রঙের স্রোত যেন সমতলে গড়াইয়া পড়িতেছে।

মাথার উপর পল্লবভারাবনত বনস্পতির শ্যাম উত্তরচ্ছদের নীচে

আরণ্যকুসুমের গন্ধমাতাল মৌমাছিদের অবিরাম গুঞ্জনধ্বনি নৈঃশব্দ্যের বুকে অতি সূক্ষ্ম সুকুমার শব্দের জাল বুনিয়া চলিয়াছে। ফুলবনের উপর দিয়া হলদে পাখাওয়ালা এক ধরণের ছোট ছোট প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়াইতেছে, ফুলগুলিই যেন পাপড়ি মেলিয়া উড়নশীল। দলমার গহন-গভীরে এ যেন এক অপরূপ রূপরাজ্য, রঙের উৎস এখানে সহস্র-ধারায় উৎসারিত।

পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে শিব-স্থান। মানুষ এখানে দেবতার জন্য মন্দির তৈরি করিয়া দেয় নাই। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে পাহাড়ের পাষাণ-গাত্রে রচিত হইয়াছে এখানকার নিভৃত দেব-নিকেতন। প্রস্তরময় পর্ব্বত-শৃঙ্গ দাঁড়াইয়া আছে অভ্রভেদ করিয়া উন্নত শিরে, মাঝখানটা তার ফাঁপা। দু'ধারে প্রায় একশ ফুট ব্যবধানে অত্যুচ্চ দু'টি পাষাণ-প্রাচীর প্রকাণ্ড এক প্রস্তরাচ্ছাদনকে মস্তক ধারণ করিয়া অবস্থিত। প্রস্তরচ্ছদের উপর বিরাট্‌কায় এক মহীরুহ ঊর্দ্ধমুখী অভীপ্সার মতন অনন্ত আকাশের পানে অগণিত শাখা-বাহু বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুদৃঢ়, সুদীর্ঘ শিকড়গুলি পর্ব্বতশিখরের পাষাণ-গাত্র বিদীর্ণ করিয়া নিম্নাভিমুখে লম্বমান। দৃশ্যটির বিরাটত্ব অনন্তের আভাস জাগাইয়া হৃদয়কে যুগপৎ শ্রদ্ধামিশ্র ভীতি ও বিস্ময়ে অভিভূত করে। শিলাময় গিরি-গাত্র কাটিয়া মানুষ তৈরি করিয়াছে ঊর্দ্ধে আরোহণের সোপান। প্রায় দুইশত সোপান অতিক্রম করিয়া সূচীভেদ্য অন্ধকারে আবৃত এক সঙ্কীর্ণ গুহামধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে শিবলিঙ্গের সম্মুখে একটি ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত। সেই বায়ুলেশহীন নীরন্ধ্র অন্ধকারে নিষ্কম্প দীপশিখাটি যেন সমাধিস্থ যোগীর চিত্তের মত নির্ম্মল, প্রশান্ত, সর্ব্বচাঞ্চল্যমুক্ত। গীতার উপমা মনে পড়ে—"যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।" জগতের সকল কলকোলাহলের ঊর্দ্ধে এই নিভৃত গুহা-মধ্যে বসিয়া নিজের

নিঃসঙ্গ আত্মার সঙ্গে মুখোমুখী গভীর পরিচয় হয়, এক অপরিমেয় শূন্যতায় মন ভরিয়া উঠে। সেই একাকিত্বের অনুভূতি তীব্র বেদনাময়। গুহাভ্যন্তরে কিছু সময় কাটাইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া প্রস্তরাকীর্ণ এক

বাদাম পাহাড়ের আদিবাসী মজুরনী—নিটোল স্বাস্থ্য আর খুশিভরা মন লইয়া ইহারা জীবনকে উপভোগ করিতেছে

সঙ্কীর্ণ পথ বাহিয়া পাহাড়ের একেবারে শীর্ষতম স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। সে জায়গায় গাছপালা লতাগুল্মের চিহ্নমাত্র নাই। শান-বাঁধানো বেদীর উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এক অভ্রভেদী বিরাট্ লৌহস্তম্ভ।

এই উন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে দেখিলাম, অনন্ত আকাশের নীচে চক্রবাল

প্রসারিত রিক্ত প্রান্তরের মুক্ত রূপ। দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত রৌদ্রদগ্ধ পীতবর্ণ তৃণরাজিতে সমাচ্ছাদিত সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, ভূপৃষ্ঠে কোথাও সবুজের লেশমাত্র নাই, গৈরিকবসনা ভৈরবী প্রকৃতির এ যেন সর্ব্বআভরণবর্জ্জিত তপঃক্লিষ্ট রুক্ষ মূর্ত্তি। প্রকৃতির এ নিরাভরণ প্রসারতা নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করে না, কিন্তু মনকে সুদূরাভিমুখী করিয়া বিরাটের অনুধ্যানে সমাহিত করে। মহাশূন্যতাকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ করিয়া আকাশ আর পৃথিবীর মহামিলনের যে অনাহত সঙ্গীত অহর্নিশি ধ্বনিত হইতেছে তাহার রেশ যেন অন্তরের একেবারে অন্তস্থলে আসিয়া প্রবেশ করে।

বহুক্ষণ পর্ব্বতশৃঙ্গে কাটিল এবার প্রত্যাবর্ত্তনের পালা। ফিরিবার পথে দেখি একটা গাছতলায় এক সাধুবাবা করাঙ্গুলি দ্বারা নাক আর কান এ দুটি ইন্দ্রিয়ের দ্বার অপূর্ব্ব কৌশলে রুদ্ধ করিয়া যোগাসনে নয়—গঞ্জিকাসনে উপবিষ্ট। গাঁজার কল্‌কেটা গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দেওয়া। এতটুকু ধোঁয়ারও যাহাতে অপচয় না হয় সেজন্য সাধুবাবার এই কসরৎ!

এবার ভিন্ন পথে প্রত্যাবর্ত্তনের পালা। পর্ব্বতাবতরণ করিয়া আবার আসিয়া নামিলাম প্রান্তরের বুকে। জনহীন মাঠের বুকে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, একটি মাত্র তারা ফুটিয়া উঠিয়াছে নিঃসীম নীলাকাশে। দল্‌মা তীর্থ পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া চলিয়াছি সম্মুখ পানে। অনন্ত জীবনের তীর্থ-পরিক্রমা-পথে আকাশের সন্ধ্যাতারাটির মতই আমিও যেন নিঃসঙ্গ, একক। রাত্রির ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া চলিয়াছি উদয়াচলের অভিমুখে। অন্তরের অন্তরতম স্থলে ধ্বনিত হইতেছে কবির আশ্বাসভরা বাণী—

"প্রাণতীর্থে চলো মৃত্যু করো জয় শ্রান্তি ক্লান্তি হীন।"

বন-প্রান্তর পার হইয়া সুবর্ণরেখার তীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। দূরে দিকচক্রবালের কাছে লৌহ-নগরীর সারি সারি আলোর মালা নজরে পড়িতেছে। গগন-প্রান্তে দিগ্বধূরা যেন জ্বালাইয়া রাখিয়াছে অগণিত মায়া-প্রদীপ।

সিংভূমের শালবনে

সিংভূমে বেড়াইতে গিয়া আমি কিছুকাল জামশেদপুরে অবস্থান করিয়াছিলাম। যেখানে আজ এই বিরাট্ শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এক সময় তাহা ছিল বাংলাদেশেরই অন্তর্গত। সিংভূমের পাহাড়-জঙ্গলে অবশ্য সাঁওতাল, হো, বীরহর প্রভৃতি আদিম জাতির লোকেদের বাস, কিন্তু সিংভূমের অধিবাসীরা বেশীর ভাগই বাঙালী, সেখানকার ভাষাও বাংলা ভাষা। তাহা সত্ত্বেও শ্রীভূমির (শ্রীহট্টের) ন্যায় সিংভূমও আজ বাংলার রাষ্ট্র-সীমার বহির্ভূত। কালীমাটি ষ্টেশন আজ টাটানগরে এবং সাকচি জামশেদপুরে নামান্তরিত।

মাত্র চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সাকচি গ্রাম পাহাড়-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, আজ সেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে প্রাচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-নগরী—ভারতের সকল জাতির মিলন-ক্ষেত্র। মানুষ এখানকার অরণ্যকে ধ্বংস করিয়াছে, পাহাড় কাটিয়া তাহার উপর দিয়া তৈরি করিয়াছে পিচ-ঢালা রাজপথ, কিন্তু এখানকার ছায়াতরু, শষ্পাবৃত তরঙ্গায়িত প্রান্তর আর ছোট ছোট বনঝোপ এখনো যেন লৌহ-নগরীর দেহে প্রকৃতির শ্যামল হস্তের স্পর্শটুকুর মত লাগিয়া রহিয়াছে।

দূরে উত্তরে আর পূর্ব্বদিকে আকাশের গায়ে মিশিয়া দাঁড়াইয়া আছে ধূসর-নীল পাহাড়শ্রেণী। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে খড়কাই নদীর ওপারে শালবনের অনন্ত প্রসার, নদীর ওপার থেকে শালবন ক্রমোচ্চভাবে উঠিয়া আকাশে গিয়া মিশিয়াছে।

খড়কাই নদীর তীরে যেখানে আমি বাসা বাঁধিয়াছিলাম, নদী মাঠ আর শালবনের সমাবেশে সে জায়গাটির দৃশ্য-বৈচিত্র্য নয়নানন্দকর। ওধারে লৌহ-নগরীতে সারাদিন অবিশ্রান্ত কর্ম্ম-কোলাহল, যন্ত্রের কর্ণপটহভেদী সুতীব্র আওয়াজ, এধারে খড়কাই নদী-তীরে গভীর নিস্তব্ধতা, পরিপূর্ণ প্রশান্তি,—অনতিদূরে ছোট একটি বন। প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে, কোথা হইতে জানিনা—যত রাজ্যের বকের দল এই বনে আসিয়া জড়ো হইত, দেখিয়া মনে হইত সুউচ্চ তরু-শাখায় যেন অজস্র সাদা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। প্রতি সন্ধ্যায় এই বনের পাশ দিয়া বেড়াইতে যাইতাম, কর্ম্মক্লান্ত দিনের শেষে দু' একজন এপথ দিয়া ঘরে ফিরিত।

এক সন্ধ্যায় দেখি একটি তেরো চৌদ্দ বছরের নীচজাতীয়া মেয়ে ছোট একটি ছেলেকে কোলে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছে। পেছন থেকে দ্রুতপদে আসিয়া এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক তাহার সঙ্গ ধরিল, প্রৌঢ়াটি জিজ্ঞাসা করিল—"তোর মাটা আর ফিরলা নাই রে বাঁশমতী।" বালিকাটি চোখ মুছিতে মুছিতে জবাব দিল—"না বুড়ি মাই, মা আর নাই আল।"

উৎকর্ণ হইয়া এদের পেছনে পেছনে চলিলাম। কথাবার্ত্তা হইতে এইটুকু বুঝিলাম যে, কিছুদিন হইল মেয়েটির বাপ মারা গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মা কার সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছে।

বনপথের বাঁকে ওরা অদৃশ্য হইয়া গেল। বাঁশমতীর করুণ কাহিনীর সবটুকু শোনা হইল না। মনে মনে কল্পনার জাল বুনিতে বুনিতে

পথ চলিতে লাগিলাম। বিজন বনপথে অশ্রুমুখী বালিকার করুণ মুখচ্ছবি চিত্তপটে চিরতরে আঁকা হইয়া রহিল।

জামশেদপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকস্থ খড়কাইয়ের ওপারকার ঐ শালবনে বিহার ছিল আমার নিত্যকর্ম্ম। রোজ সূর্য্যাস্তের পর শালবনের পেছন দিককার আকাশে যখন বিচিত্র বর্ণমাধুরী ফুটিয়া উঠিত তখন পথে বাহির না হইয়া থাকিতে পারিতাম না।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। সুদূর দিগন্তলীন বনশ্রেণীর ওপারে সূর্য্য কিছুক্ষণ হইল অস্ত গিয়াছে। শীতের আকাশ সম্পূর্ণ নির্মেঘ। কনকনে শীত পড়িয়াছে, পাহাড় দেশের প্রচণ্ড শীত। বেশ করিয়া গরম কাপড়-চোপড় পরিয়া, শালখানা গায়ে জড়াইয়া দিব্যি বাবুটি সাজিয়া শালবন-বিহারে রওনা হওয়া গেল। বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রান্তরের বুকের উপর দিয়া লাল মাটির রাস্তাটি কখনো উপরে উঠিয়া কখনো বা নীচে নামিয়া বরাবর খড়কাই নদীতটাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। ক্রমে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার বন-প্রান্তরে ঘনাইয়া আসিল। হঠাৎ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আকাশ যেখানে নত হইয়া প্রান্তরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে সেই সুদূর চক্রবাল-সীমায় তাকাইয়া মনে হইল যেন পৃথিবীর বক্ষ ভেদ করিয়া প্রকাণ্ড একটা জমাটবদ্ধ অগ্নি-পিণ্ড ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতেছে। ক্রমে সেই অগ্নিপিণ্ড পীত আভা ধারণ করিতে লাগিল। দিগন্তের প্রান্ত-সীমা হইতে পূর্ণ-চন্দ্রোদয়ের এই মহিমা-মণ্ডিত দৃশ্য দেখিয়া মনে হইল আজিকার রাত্রিটা জীবনে সার্থক। চাঁদের আলোয় মাঠ-বন-গিরি-নদী ধীরে ধীরে আলোকিত হইয়া উঠিতে লাগিল। পশ্চিম দিকে চলিতে চলিতে অবশেষে

খড়কাই নদীর বালুচরে গিয়া পৌছিলাম। শুভ্র সিকতাভূমি জ্যোৎস্নায় চিকচিক করিতেছে, সুবিস্তীর্ণ বালুশয্যার এক প্রান্ত দিয়া উপল-প্রতিহতগতি ক্ষীণকায়া, স্বল্পতোয়া খড়কাই নদী প্রবাহিত। নদীগর্ভে এখানে-সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড-সমূহ, যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জলচর প্রাণীগুলি জ্যোৎস্নালোকে পিঠ মেলিয়া দিয়া পড়িয়া আছে।

ধীরে ধীরে নদীগর্ভে আসিয়া নামিলাম। জ্যোৎস্নালোকে স্ফটিকস্বচ্ছ জলের নীচেকার নুড়ি আর বালুকারাশি পর্য্যন্ত সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। নদী পার হইয়া শালবনের ভিতরকার সুঁড়ি পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম, দুইধারে বনানীর অনন্ত বিস্তার। জ্যোৎস্নালোকিত স্তব্ধ বিজন অরণ্য-পথের উপর শালগাছের বিচিত্র রেখায়িত ছায়া পড়িয়াছে। অরণ্যভূমিতে বনলক্ষ্মী স্বহস্তে যেন শাদায়-কালোয় সুন্দর আল্পনা আঁকিয়া রাখিয়াছেন। মাথার উপর তারা-ভরা একফালি আকাশ। মাঝখানে মস্ত বড় পূর্ণিমার চাঁদ। শালবনের উপর তারকাশোভিত আকাশটা যেন মণি-খচিত চন্দ্রাতপের মত টাঙানো। মধ্যস্থলে পূর্ণচন্দ্র যেন নিটোল মধ্যমণির মতো দোদুল্যমান। প্রকৃতির নিভৃত নিকেতনে জ্যোৎস্নারাত্রির রহস্যময় রূপটি মনকে মুগ্ধ করিল, বনতলে তৃণাসনে বসিয়া আকাশ-বনানীর অঙ্গাঙ্গি মিলনের দৃশ্য দুই চোখ ভরিয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম।

অকস্মাৎ দূরাগত বাঁশীর স্বরে উৎকর্ণ হইয়া উঠিলাম, কি সুমধুর প্রাণ-মাতানো সাওতালী বাঁশীর তান! মনে হইল বনস্থলীতে কাহার করুণ ক্রন্দন যেন রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে। বাঁশীর স্বরে আত্মহারা হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত চলিতে চলিতে অবশেষে এমন এক জায়গায় আসিয়া পৌছিলাম ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রনিবিড় তরুশ্রেণী যেখানে রচনা

করিয়া রাখিয়াছে গভীর অন্ধকার। তখন চমক ভাঙিল, বুঝিলাম ভুল-পথে আসিয়াছি। চারিদিকে তাকাইলাম, আলোর রেখা কোথাও নজরে পড়িল না। সর্ব্বনাশ, তবে কি শেষটায় শালবনে পথ হারাইলাম। কিন্তু বনের যা নমুনা তাহাতে এখানে "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ" একথা বলিবার মত কোনো ত্রাণকর্ত্রীর আবির্ভাবের কল্পনাও তো অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। দস্তুরমত ভড়কাইয়া গিয়া পথের সন্ধানে দ্রুত-পদে চলিতে লাগিলাম। খানিক পরে দেখি বন তত ঘন নয়, গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ঈষৎ জ্যোৎস্নাও আসিয়া পড়িয়াছে, পথের রেখাও যেন নজরে পড়ে। কিন্তু খানিকদূর আগাইবার পরই এমন জায়গায় গিয়া পৌঁছিলাম যেখানে অন্ধকার গাঢ়তর। ঘন তরুশ্রেণীতে আর লতাজালে পথ অবরুদ্ধ। পাশাপাশি আলো আর অন্ধকারের এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ যে হইতে পারে তাহা না দেখিলে কল্পনা করা কঠিন। বুঝিলাম বাস্তবিকই গহন অরণ্যে পথ হারাইয়াছি, পথ আর হয়তো খুঁজিয়া পাইব না। আমি যাহাকে পথ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম আসলে তাহা বনতলের তৃণ-লতা-গুল্মহীন খানিকটা ফাঁকা জায়গা মাত্র। সিংভূমের অরণ্যের সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয় আছে তাহাতে একথা আমি ভালো করিয়াই জানি যে, একবার ভুল পথে পা বাড়াইলে অন্ধকার বনস্থলি হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব।

কল্পনায় যে-ছবি মনকে মুগ্ধ করে তাহারই বাস্তব রূপ যে কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারে, তাহা উপলব্ধি করিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। অনন্তপ্রসারিত অন্ধকার অরণ্যে রাত্রির রহস্যময় রূপ আমার কল্পনাকে বিশেষ ভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিত, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নৈশ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন অরণ্য আমার সৌন্দর্য্যবোধকে আদৌ

জাগ্রত করিল না, বরং তাহা আমার অন্তরে এমন এক নিদারুণ ত্রাসের সঞ্চার করিল যে, 'আমার আর সমস্ত অনুভূতি যেন লোপ পাইয়া গেল। ডাইনে বামে আশেপাশে নিকষকৃষ্ণ অন্ধকার—এ অন্ধকার যেন জগদ্দল পাথরের মত পৃথিবীর বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে, একে যেন হাত দিয়া স্পর্শ করা যায়। অন্ধকারাবৃত অরণ্যকে মনে হইল যেন একটা জীবন্ত সত্তা, এ অজগর অরণ্য যেন আমাকে কুক্ষিগত করিয়া আপন জঠরে জীর্ণ করিয়া ফেলিতে উদ্যত। এই অন্ধকারের কবল হইতে আলোকিত পৃথিবীতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য আমার সমস্ত অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। জননী-জঠর হইতে আলোকপূর্ণ পৃথিবীতে আসিবার জন্য শিশুর মনে বোধ করি জাগে এমনি ধরণের তীব্র আকুতি, এমনি আকুলতায়ই বুঝি কুঁড়ির অন্ধকার আবরণ বিদীর্ণ করিয়া পুষ্পসমূহ সূর্য্যালোকে ফুটিয়া উঠে।

আলোর প্রত্যাশায় অরণ্যের তমিস্র ভেদ করিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। কি ভীতিজনক সুগভীর নিস্তব্ধতা! বনস্পতিসমূহের ঝরাপাতার পতনের শব্দটুকু পর্য্যন্ত শোনা যায়। শুনিয়াছিলাম, এ অরণ্য বন্য হস্তীদের নৈশবিহার-ভূমি। যদি যূথপতিদের বপ্রক্রীড়ার বাতিক চাগিয়া উঠে তবেই হইয়াছে আর কি! হঠাৎ মনে হইল গাছপালা মড়মড় করিয়া উঠিতেছে। বুনো জানোয়ার পেছনে তাড়া করিয়া আসিতেছে নাকি? প্রাণের ভয়ে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে পেছনের শব্দ থামিয়া গেল—খানিক বাদে আবার সেই আওয়াজ! শেষে বুঝিলাম ভয় নাই, এ কোনো ধাবমান জন্তুর পদশব্দ নয়। মাঝে মাঝে অরণ্যে দমকা হাওয়া দেয়, তারই ফলে পত্রে পত্রে জাগে মর্ম্মর-ধ্বনি।

চলিতে চলিতে কিছুদূর গিয়া দেখিলাম বন খানিকটা পাতলা এবং

অন্ধকারও তরলিত হইয়া আসিয়াছে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে একটা আঁকাবাকা পথ-রেখা নজরে পড়িল। আনন্দে আকাশ ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইল। অবশেষে পথের সন্ধান তো পাইয়াছি, মানুষের পায়ে চলার পথ। আশ্চর্য্য! মানুষের চলাচলের পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছি একথা ভাবিতেই মনে যেন কতকটা সাহস ভরসা ও শক্তি পাইলাম। খানিকদূর গিয়া দেখি রাস্তাটি খাড়া বহু নিম্নে নামিয়া গিয়াছে। ক্রমাবরোহণ করিতে করিতে যেন একেবারে পাতালে আসিয়া নামিলাম। বনের গভীর তলদেশ হইতে রাস্তাটি আবার ক্রমোচ্চভাবে উঠিয়াছে। ঐ চড়াই পথ বাহিয়া অবশেষে এক সমতল ফাঁকা জায়গায় আসিয়া পৌছিলাম। মনে হইল যেন একটা চরম দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে। মাথার উপরকার সুনীল উদার আকাশ হইতে অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ঝরিয়া পড়া আলোকের অজস্র প্লাবন আমার দেহমনকে যেন অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়া দিল।

কোথায় যে আসিয়াছি প্রথমে তাহা ঠাহর করিতে পারি নাই। খানিক বিশ্রামান্তে একটু চাঙ্গা হইলে পর চারিদিকে ভালো করিয়া তাকাইয়া বুঝিতে পারিলাম সেটা একটা পাহাড়ী নদীর অত্যুচ্চ তীর। নদীটির পাড় ধরিয়া সুমুখের পানে খানিকদূর গিয়া দেখি ভীষণ-রমণীয়, অপূর্ব্ব দৃশ্য। সুদূর দিকচক্রে যেন আগুন ধরিয়া গিয়াছে, বুঝিলাম এই লেলিহান অগ্নিশিখা উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে লৌহ-নগরী জামশেদপুরের কারখানা হইতে। আশ্বস্ত হইলাম—আর ভয় নাই, ঐ অগ্নিশিখা সিংভূমের অরণ্য-প্রান্তরে পথহারা আমাকে কতবার পথ দেখাইয়াছে। আজও ঐ আলোক-শিখা দেখিয়া অকূলে কূল পাইলাম। ঐ আগুনের শিখা লক্ষ্য করিয়া চলিলেই তো গন্তব্য-স্থলে পৌছিতে পারিব।

নদীর তীরে বসিয়া পেছনের ভীম-কান্ত অরণ্যের পানে আবার ফিরিয়া তাকাইলাম। সিংভূমের এই মহারণ্যে লাভ করিয়াছি আমি আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। অরণ্যের প্রকৃত স্বরূপ সমস্ত সত্তা দিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, তার আত্মার সঙ্গে হইয়াছে মুখোমুখী গভীর পরিচয়—এই রাত্রিটির কথা সারা জীবন অক্ষয় হইয়া থাকিবে আমার স্মৃতিপটে।

সুমুখে বহু নিম্নে নদীর বুকে তারকাখচিত খানিকটা আকাশের ছায়া পড়িয়াছে। সেই উচ্চ স্থান হইতে নদীটিকে দেখাইতেছে ঠিক যেন "মুক্তাগুণমিব ভুবঃ"—বসুমতীর কণ্ঠ-বিলম্বিত একটি মুক্তাহারের মত।

এবার নদীগর্ভে নামিবার জন্য ডানদিকে চলিতে লাগিলাম, কিন্তু একি! পাড় যে সর্ব্বত্রই সমান উচ্চ, ঢালু পথ তো কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না। চলিতে চলিতে হঠাৎ হুমড়ি খাইয়া পড়িলাম এক কাঁটাওয়ালা আগাছার জঙ্গলের মধ্যে। উঠিয়া দেখি সুমুখে গভীর খদ, তা পার হওয়া হনুবংশীয়দের পক্ষে সম্ভবপর হইলেও মনুবংশীয়দের পক্ষে নয়।

অনেকক্ষণ খদের ধারে বসিয়া থাকিয়া আবার অবতরণ-পথের সন্ধান করিতে লাগিলাম। ভিন্ন পথ ধরিয়া খানিকদূর গিয়া দেখি সে জায়গাটা অপেক্ষাকৃত ঢালু, আর সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে একটা উৎপাটিতমূল বিরাট্ বনস্পতি। নীচে গুল্মবৃক্ষের জঙ্গল। অগত্যা সেই মহীরুহের ডাল অবলম্বন করিয়া নীচে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। তারপর যে ব্যাপারটি সুরু হইল তাহা যেমন করুণ তেমনি হাস্যকর। কাটাওয়ালা গাছের জঙ্গলের ওপর দিয়া ফুটবলের মত গড়াইতে গড়াইতে ক্রমশঃ নীচে নামিতে লাগিলাম, বুনো কাটায় হাত-পা ছড়িয়া যাইতে লাগিল, কাপড়-চোপড় গেল ছিঁড়িয়া। গড়ানে জায়গা

দিয়া গড়াইতে গড়াইতে অবশেষে নদীর নীচেকার শিলাময় তটভূমিতে কয়েকটি পাষাণখণ্ডে আটকাইয়া গেলাম।

কিন্তু এখন নদী পার হই কি উপায়ে? আর যে এক পা-ও চলিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু এখানে বসিয়া থাকাও তো নিরাপদ নয়। ব্যাঘ্র মহাশয়েরা শুনিয়াছি রাত্রে জলের ধারেই শুভাগমন করিয়া থাকেন এবং জলযোগের এমন সুযোগটি যে তাহারা ব্যর্থ হইতে দিবেন না, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই। তখন শিলাময় তীরভূমির উপর দিয়া বাঁদিকে চলিতে চলিতে একটু একটু করিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম। সুমুখের পানে তাকাইয়া দেখি আর মাত্র কয়েক হাত দূরে জলরেখা চক্ চক্ করিতেছে। ভাবিলাম, এতক্ষণে ফাঁড়া কাটিল, কিন্তু দুর্ভোগের যে আরো অনেক বাকি তাহা কি তখন জানিতাম!

জলে পা দিবামাত্রই দেহের নিম্নাংশ একটু একটু করিয়া নীচেকার কাদার ভিতরে ঢুকিতে লাগিল। বুঝিলাম এবার আর বাঁচোয়া নাই। যাই হোক ঊরু পর্য্যন্ত ডুবিবার পর আটকাইয়া যাওয়ায় জীবন্ত কর্দ্দম-সমাধির হাত হইতে রক্ষা পাইলাম। নিজের অবস্থাটা ভাবিয়া এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পাইল। দুনিয়ার মেয়াদ আর যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বোধ করি, এমনিধারা গাড়া শিব হইয়াই খাড়া থাকিতে হইবে, আর ইতিমধ্যে ব্যাঘ্রাচার্য্যেরা যদি দয়া করেন তাহা হইলে পরিণত হইতে হইবে কবন্ধে। যাই হোক্ কবন্ধে পরিণত হইতে হয় নাই বলিয়াই প্রবন্ধ লিখিয়া ব্যাপারটা পাঠকদের জানানো সম্ভবপর হইল।

মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াইয়া জীবন যে কত প্রিয় তাহা যেন সমস্ত চৈতন্য দিয়া নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলাম। চীৎকার করিয়া বলিয়া

উঠিতে ইচ্ছা হইল আমি বাঁচিতে চাই। বাঁচিবার সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা, কোথা হইতে জানিনা আমার দেহে সঞ্চার করিল অমিত শক্তি। আমার শিরায় শিরায় স্নায়ুতে স্নায়ুতে উষ্ণ শোণিতস্রোত যেন উদ্দাম বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কর্দ্দমাক্ত মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রাণপণ শক্তিতে দুই হাতে কাদা সরাইয়া সেই পঙ্কশয্যা হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া আনিলাম। তারপর নদীতীরস্থ শিলাসনে বসিয়া চারিদিকে ভালো করিয়া তাকাইলাম। ডান দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত কর্দ্দম-স্তর দেখিয়া বুঝিলাম এদিকে পলি পড়িয়াছে, মনে হইল বাঁদিক পানে চলিলে হয়তো বালুচরের দেখা মিলিবে। বাঁয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর পদতলে বালুচরের স্পর্শ অনুভব করিলাম। চাহিয়া দেখি নদীগর্ভে ছোট একটি শিলাময় টিলা যেন এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত এক সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। এতক্ষণে নদী পার হইবার উপায় তবে হইল। কাছে গিয়া দেখি বালুচরের শেষপ্রান্ত থেকে বেশ খানিকটা দূরে নদীগর্ভ হইতে সুরু হইয়াছে সেই টিলা। জলে পা ডুবাইলাম, থই পাওয়া যায় না। কি আর করি! অগত্যা শাল-জামা-কাপড়-জুতাসুদ্ধ নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। শীতকালের পাহাড়ী নদীর জল একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা, মনে হইল সারাটা দেহ যেন ধীরে ধীরে জমিয়া যাইতেছে। আর শীতকালেও পার্ব্বত্য নদীর কি প্রখর স্রোত! ওদিকে পোশাক-পরিচ্ছদও ফুলিয়া একেবারে ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে নদীগর্ভস্থ বড় বড় পাথরে লাগিতেছে প্রচণ্ড আঘাত, ঢক ঢক করিয়া খানিকটা ঘোলা জল পেটের ভিতরে ঢুকিয়া গেল, মনে হইল নাড়ি-ভুঁড়িসুদ্ধ যেন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

যাই হোক খানিকদূর সাঁতরাইয়া গিয়া তো পাথরের ঢিবিতে

উঠিলাম। কিন্তু সুমুখ পানে চাহিয়া চক্ষুস্থির! আরো খানিকটা জায়গা সন্তরণপূর্ব্বক আর একটা পাথুরে টিলায় গিয়া উঠিতে হইবে—সেটা একেবারে ওপার অবধি চলিয়া গিয়াছে।

শীতে সর্ব্বাঙ্গ অবশপ্রায়, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি না, কাঁপিতে কাঁপিতে হঠাৎ পাথরের উপর পড়িয়া গেলাম, মনে হইল হয়তো বা সম্বিৎই লোপ পাইয়া যাইবে।

হঠাৎ মনে কি যে একটা উৎকট ভাবের উদ্রেক হইল বলিতে পারি না—নিজের উপর জাগিল একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ, একটা মারাত্মক কিছু করিবার প্রবৃত্তিকে যেন কিছুতেই আর দমাইয়া রাখিতে পারিতেছি না, বিচার-শক্তি, চিন্তা করিবার ক্ষমতা সব কিছুই যেন লোপ পাইয়া গিয়াছে। স্নায়ু-মণ্ডলীতে জাগিয়াছে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা। মরিয়া হওয়া বোধ করি ইহাকেই বলে। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া দেহের সবটুকু শক্তি সঞ্চয় করিয়া সশব্দে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম নদীর জলে। তারপর প্রতিকূল স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যেমন করিয়া যে শাল জামা কাপড়-জুতাসহ শিলাময় পাহাড়ের উপর গিয়া উঠিলাম' সে রহস্য আমার কাছে অজ্ঞাত।

প্রস্তর-স্তূপ পার হইয়া এপারে আসিয়া পৌঁছিলাম। পদতলে শুভ্র সুখস্পর্শ বালুচর, অদূরে একটা ঝুরিনামা বটগাছ। এ কোথায় আসিয়াছি! বাঃ! ঐ যে দূরে রাত্রির আকাশে অনির্ব্বাণ হোমশিখার মত জলে লৌহ-নগরীর প্রদীপ্তোজ্জ্বল অগ্নিশিখা। কাপড় জামা আর শালখানা ভালো করিয়া নিংড়াইয়া লইলাম, ভিজা শালটাই দিলাম গায়ে জড়াইয়া।

সুমুখে জ্যোৎস্নাভরা উন্মুক্ত প্রান্তর। সিক্ত পরিচ্ছদে কাঁপিতে কাঁপিতে আকাশস্পর্শী অগ্নিশিখা লক্ষ্য করিয়া পাড়ি দিলাম প্রান্তর-পথে।

যে ভাগ্য-বিধাতা ঘরের আরাম হইতে ছিন্ন করিয়া আনিয়া আমাকে দুর্গম পথের অভিযাত্রী করিয়াছেন, উর্দ্ধে জ্যোৎস্নাপুলকিত আকাশের পানে চাহিয়া মনে মনে তাঁহাকে প্রণতি জানাইলাম। আমার এই নিশীথ অভিযানের সাক্ষী নিষুপ্ত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় প্রাণী নাই, কিন্তু সেই নিত্য-জাগ্রত পরম দেবতা হয়তো স্বর্গ হইতে প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইয়া আছেন। তাঁহারই প্রসাদে দুঃখের ভিতর দিয়া বারবার লাভ করিতেছি, জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা, অরণ্য-পর্ব্বতে অভিযানের পরম আনন্দ!

তাম্রখনির সন্ধানে

সিংভূমে থাকিতে একটা বোহেমিয়া সুলভ-উদ্দামতা যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। শালবনে, পথে-প্রান্তরে এবং তাম্রখনি আর লৌহ-খনির সন্ধানে কত যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি তাহার আর অন্ত নাই। এই ঘোরাঘুরির দরুন সিংভূমের প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলাম তাহার মূল্য বড় কম নয়। সিংভূমের অরণ্যের নির্জ্জনতায় আত্মসমাহিত হইয়া নিজের প্রকৃত সত্তাকে চিনিবার সুযোগ আমি লাভ করিয়াছিলাম।

কোথায় যেন পড়িলাম যে, নাড়ুপ নামক স্থানে কতকগুলি তাম্র-খনি বিদ্যমান। খনির কথা শুনিলে চিরকালই শনি ঘাড়ে চাপিয়া বসে, তাম্রখনির সন্ধানে একদিন একলাই নাড়ুপের পথে রওনা হইলাম।

মাইল তিনেক অগ্রসর হইবার পর একটা বস্তিতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বত্থ আর তেঁতুল গাছের ছায়ার নীচে ছবির মত বস্তোদের দু'একটি কুটির। কোনো বাড়ির সামনে মাটির ফটক। উঠানে দড়ির খাটিয়ায় স্ত্রী-পুরুষ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছে। আমার আহ্বানে মাথায় ঝাঁকড়া চুল একটি হো গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাম্রখনির সন্ধানে রওনা হইলাম। লোকটির নাম দিগা। হাতে তার তীর-ধনুক, তীরের আগায় ধারালো লোহার ফলা। দিগা বলিল যে, নাদুপের খনিগুলি এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং সেগুলি বাঘ-ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জানোয়ারের বিশ্রাম-স্থল।

কিছুদূর গিয়া একটা জঙ্গলাকীর্ণ ছোট পাহাড়ের গা বাহিয়া আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম। এই পাহাড়টিতে লোকজনের বসতি একেবারে নাই, রাস্তাঘাটের বালাইও নাই। একবুক পড়াশী গাছের জঙ্গল ভাঙিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে বড় বড় পড়াশী-কাঁটা যেন সাঁড়াশীর মত আঁকড়াইয়া ধরিতে লাগিল। বহু আয়াসে উপরে উঠিলাম। গিরিসানুদেশ খণ্ড খণ্ড প্রস্তরে সমাকীর্ণ। পাথরের উপর দিয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া দেখি পাহাড়ের একেবারে প্রান্ত-সীমায় উপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত ফাটল-ধরা বিরাট্‌কায় একটি প্রস্তরস্তম্ভ অভ্রভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার গায়ে প্রকৃতির আপন হাতে দেওয়া হলুদ রঙের ছোপ। এই পীত বর্ণানুরঞ্জিত, নৈসর্গিক প্রস্তরস্তম্ভের নীচে প্রকাণ্ড একটি গুহা। দিগা বলিল, বর্গীর হাঙ্গামার সময় এ অঞ্চলের অধিবাসীরা নাকি এই সমস্ত গুহা নির্ম্মাণ করিয়া এগুলিতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু ইহা জনশ্রুতি মাত্র। আসলে প্রাচীনকালের মানুষ তামা সংগ্রহ করিবার জন্য এই পাহাড়ের পাষাণগাত্র কর্ত্তন করিয়াছিল, এবং তাহারই দরুন এই সকল গুহার সৃষ্টি হইয়াছে। উভয়ে একটা গুহামধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। উপরকার প্রস্তরাচ্ছাদনে সবুজ শেওলা পড়িয়া কি অপূর্ব্ব স্বাভাবিক শ্রী-ই

না ফুটিয়া উঠিয়াছে, কে যেন ছাদটিকে মসৃণ মখমলের আচ্ছাদনে মুড়িয়া রাখিয়াছে। দিগা গুহামধ্যস্থ একটি প্রস্তরখণ্ড সরাইলে দেখিলাম, অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথ যেন পাতালে চলিয়া গিয়াছে। দিগা বলিল, ঐ পথ দিয়া খানিকদূর গেলেই এককোমর জল। বুঝিলাম আদিম মানব তাম্রপ্রস্তর হইতে তামা সংগ্রহ করিবার জন্যই এই সুড়ঙ্গ-পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং যখন ভূগর্ভোত্থিত জলধারায় তাহাদের কার্য্য ব্যহাত হইয়াছিল তখনই তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল। এমনি ধরণের পাঁচ ছয়টি গুহা দেখিলাম, সবগুলাই বুনো জানোয়ারের মূত্রপুরীষের দুর্গন্ধে ভরপুর। গোটা পাহাড়টাই নাকি এ ধরণের গুহায় পরিপূর্ণ। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, আধুনিক কালে এই সমস্ত গুহার কোনটি হইতেই কণামাত্র তাম্র সংগ্রহ করাও নাকি সম্ভবপর হয় নাই। প্রাচীন কালের মানুষ এই সকল তাম্রপ্রস্তর হইতে সমস্ত তামা নিঃশেষে কাটিয়া লইয়া গিয়াছিল। কোনো কোনো গুহার সামনে পাথর-বাঁধানো খানিকটা জায়গা। সম্ভবতঃ এইগুলিই আদিম ব্লাস্ট ফার্নেস—পাথর গলাইয়া তাম্রনিষ্কাশনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। কি ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে সেকালের মানুষ পাহাড় হইতে তামা কাটিত, তাম্র-প্রস্তর গলাইত ইত্যাদি ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় এবং তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি এবং বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিরও তারিফ না করিয়া পারা যায় না।

গুহাগুলি দেখিয়া নীচে নামিয়া আসিবার পর নজরে পড়িল, ডান দিকে আগাগোড়া প্রস্তরে সমাচ্ছন্ন ছোট একটি পাহাড়,—তাহাতে তৃণলতার লেশমাত্রও নাই। কালো রঙের ফাঁদালো হাঁড়ি মাথায় এক বনদুহিতা পাহাড়ের উপর উঠিয়া নিম্নাভিমুখী একটা সুড়ঙ্গ-পথ দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ব্যাপারটা বড় রহস্যময় ঠেকিল। দিগাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, মেয়েটি পাহাড়ের ভিতরকার গুহা হইতে পানীয় জল আনিতে

যাইতেছে, আশপাশের যাবতীয় বস্তির লোকদেরই নাকি এই গুহামধ্যস্থ একটি জলাশয়ের জলের উপর নির্ভর করিতে হয়। গুহাভ্যন্তরস্থ জায়গাটা সরোবরের কথা কল্পনাকে বিশেষ ভাবে নাড়া দিল, দেখিবার জন্য অত্যন্ত কুতূহলী হইয়া উঠিলাম। দিগাকে লইয়া গুহামুখে গিয়া পৌঁছিলাম। ধাপ-কাটা অপরিসর সুড়ঙ্গপথ ক্রমনিম্নভাবে চলিয়া গিয়াছে। মাথার উপরকার প্রস্তরচ্ছদে সবুজের ছোপ। আমি আগে আগে চলিতে লাগিলাম, দিগা আসিতে লাগিল পিছনে পিছনে। প্রথমে কিয়ৎদূর পর্য্যন্ত পাতলা অন্ধকার, তারপর অন্ধকার ক্রমশঃ ঘন হইয়া আসিতে লাগিল। চলিতে চলিতে হঠাৎ হুমড়ি খাইয়া জলমধ্যে পড়িয়া গিয়া নাকানি-চোবানি খাইয়া উঠিলাম। ততক্ষণে অন্ধকার কতকটা চক্ষুসহা হইয়া আসিয়াছে। লক্ষ্য করিয়া দেখি, ভূগর্ভোত্থিত জলরাশি গুহামধ্যে এক সুরম্য সরোবরের সৃষ্টি করিয়াছে, ধাপগুলি নামিয়া গিয়াছে একেবারে জলের ভিতর পর্য্যন্ত, জলতলে বিছানো রহিয়াছে ছোটবড় অজস্র উপলখণ্ড; জলস্রোত গুহার পিছনদিককার পাষাণ-প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া দুইটি ধারায় বিভক্ত হইয়া দুইদিকে অতল পাতালে চলিয়া গিয়াছে। উপলব্যাহতগতি জলধারার অতি মৃদু কলতান সেই জনহীন নিস্তব্ধ নীরব অন্ধকার-পুরীতে যেন ধ্বনির ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতেছে। পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে মনে হইতেছে, ছেলেবেলায় রূপকথায় শোনা পাতালপুরী যেন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়া কল্পলোক হইতে নামিয়া আসিয়া দৃষ্টিরবিভ্রম জন্মাইতেছে, এখানে পাতালকন্যাদের অস্তিত্বও মোটেই যেন অসম্ভব নহে। এই ভূগর্ভস্থ সরোবর যেন তাহাদের জলক্রীড়ার নিভৃত নিকেতন। কবিধারার কলতান যেন জলকেলিরতা পাতাল-কন্যাদের অলঙ্কার-শিঞ্জনের মত শ্রবণের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে শুনিতে শুনিতে সমস্ত অন্তর কেমন যেন মোহাবিষ্ট হইয়া যায়।

ভূগর্ভের অভ্যন্তরস্থ পাতালপুরী রহস্যময় অন্ধকারে আবৃত বলিয়াই তাহা মনে এক ধরণের ভীতিমিশ্র বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। পাতাল-পুরীর রূপ-লোকের দর্শনলাভ করিবার সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে শুধু তিনিই বুঝিতে পারিবেন, কি গভীর তার আকর্ষণ, সে-দৃশ্য অন্তরে কি অভিনব অনুভূতির সঞ্চার করে। খাসিয়া পাহাড়ের রূপনাথ গুহা আর নাহুপ গ্রামের নিকটবর্ত্তী এ পাতাল-সরোবর দর্শনের ভীতি-বিস্ময়-আনন্দ-পূর্ণ অভিজ্ঞতার কথা আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে সারা জীবন অক্ষয় সঞ্চয় হইয়া থাকিবে।

পাতালপুরী হইতে বাহিরে আসিয়া আমরা উভয়ে আবার বস্তিতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

দিনকতক পরে রাখামাইন্স স্টেশনের নিকটবর্ত্তী আরো কতকগুলি তাম্রখনি দেখিবার জন্য পায়ে হাঁটিয়া রওনা হইলাম। রাস্তার দুই পাশে কোথাও শালবন কোথাও বা সাঁওতাল পল্লী। পদব্রজে ভ্রমণে প্রকৃতি আর মানুষের সঙ্গে যতটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় ট্রেনে ভ্রমণে তার শতাংশের একাংশও হয় না। ভ্রমণ আমার বিলাস নয়, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়া। আর প্রকৃতির স্নেহক্রোড়ে প্রতিপালিত মানুষদের ভালো করিয়া জানা এ দুটি আকাঙ্ক্ষায়ই দীর্ঘকাল আমি অরণ্য-পর্ব্বতে-পথে-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এজন্য দুঃখ ভোগও হয়তো করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে যাহা লাভ করিয়াছি তাহার মূল্য বড় কম নহে।...

শীতের প্রভাত। চলিয়াছি রাখার পথে। ক্লান্ত হইয়া একটি বনের ধারে আসিয়া বসিলাম। অনতিদূরস্থ তরুছায়াপ্রচ্ছন্ন সাঁওতাল

কুটীর হইতে কানে ভাসিয়া আসিতেছে ঢেঁকির আওয়াজ, বনের ভিতরে কাঠুরিয়ারা ঠক ঠক করিয়া কাঠ কাটিতেছে। শালবনে সুরু হইয়াছে সারসকুলের সরস কূজন। দূর বনান্তে একটানা ঘুঘুর ডাক সমস্ত মনটাকে কেমন যেন উদাস করিয়া দিতেছে। নির্জ্জন বনের মধ্যে অনাবৃতগাত্র, কষ্টি-পাথরের মত কালো একটি মেয়ে বুনো কুল সংগ্রহ করিতেছে। পথের পাশে পাকা পাকা কুলে ভরা অজস্র কুলগাছ। বন-মধ্যে এখানে-সেখানে পড়িয়া আছে মর্ম্মর-প্রস্তরের মত শুভ্র মসৃণ বড় বড় পাথরের চাঁই। সমগ্র বনভূমি শাল, শিরীষ আর কুলগাছে ভরা। ফাঁকা জায়গায় আকন্দ গাছে অজস্র বেগুনি রঙের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। বনের শ্যামলিমা পাহাড়ের নীলিমায় গিয়া বিলীন হইয়াছে।

একটি সাঁওতাল বস্তিতে আসিয়া পৌছিলাম। ছবির মত সুন্দর এক একটি বাড়ী। ঘরগুলি ত্রিবর্ণরঞ্জিত, ভিটায় কলো রঙের প্রলেপ, দেওয়ালের নিম্নার্দ্ধে গেরুয়া রং, উপরিভাগে শাদা রঙের ছোপ। গেরুয়া আর শাদা রঙের মাঝখানে কালো বর্ডার দেওয়া—দোচালা ঘর, তাহাতে জানালাদির বালাই নাই। বাড়ীর সামনের খানিকটা জায়গা মাটির দেওয়ালে ঘেরা—তাতে কলাগাছ, তরি-তরকারী আর ফুলের বাগান, বাগানে গাঁদা ফুলের প্রাচুর্য্য। মেয়েরা দড়ির খাটিয়া বুনিতেছে, কেউ কেউ ঢেঁকি পাড় দিতেছে, একটি মেয়ে ঝাঁট দিয়া ঘরের দেওয়াল সাফ করিতেছে। সাঁওতালদের গৃহ শুধু যে বাসোপযোগী তাহা নয়, মেয়েদের সযত্ন পরিমার্জ্জনে তাহা ভিতরে এবং বাহিরে শ্রী-মণ্ডিত।

সাঁওতালদের একটা বৈশিষ্ট লক্ষ্য করিলাম। রাস্তার পাশে বা প্রান্তরে যেখানেই ঘনসন্নিবিষ্ট তরুরাজি স্নিগ্ধচ্ছায়া বিস্তার করিয়া

দাঁড়াইয়া আছে সেখানেই আসিয়া তাহারা ঘর বাঁধিয়াছে। এমনি ভাবে সিংভূমের পথে-প্রান্তরে বনচ্ছায়াতলে গড়িয়া উঠিয়াছে অসংখ্য সাঁওতাল বস্তি। যুগধর্ম্মের প্রভাবে অবশ্য অনেকে অরণ্য-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া তথাকথিত সভ্য মানুষের মুল্লুকে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে, কিন্তু গাছপালার প্রতি ইহাদের ভালোবাসা আজো অটুট রহিয়াছে। তরুচ্ছায়ানিবিড় এমনি একটি সাঁওতাল বস্তিতে দেখি, মেয়েরা একটা তক্তার উপর আছড়াইয়া ধান ঝাড়িতেছে, উঠানের একপাশে স্তূপীকৃত ধানের আঁটি। কতকগুলি মেয়ে গুটিকতক কাঁসার বাসন লইয়া রওনা হইয়াছে পুকুর-ঘাটে। সুমার্জ্জিত বাসন-কোসনগুলা যেন রূপার মত ঝকঝক করিতেছে। ক্ষেতে মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে ধান কাটিতেছে। রাস্তার পাশেই একটি ঘরে এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক রান্না করিতেছে। উঠানে সেই ভরা দুপুরেই দড়ির খাটিয়ায় শুইয়া এক বুড়া উদাসভাবে দূরের পাহাড়ের পানে তাকাইয়া আছে—ভাবখানা এই যে, "এমনি ভাবেই যায় যদি দিন যাক্ না।"

অপরাহ্ণকালে রাখামাইন্স রেল ষ্টেশনে পৌঁছিয়া খনি দেখিবার জন্য ষ্টেশনের পেছন দিককার রাস্তা দিয়া রাখা ব্রিজের উপরে আসিয়া পৌঁছিলাম। ডান দিকে জঙ্গলের ভিতর একটি অট্টালিকা। পাহাড়ীরা একে বলে মরিস সাহেবের 'খাদান'। মরিস সাহেবের প্রযত্নে একদা এই অরণ্যের বুকে গড়িয়া উঠিয়াছিল এক বিরাট কারখানা। যান্ত্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে অরণ্যের শোভা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল কিন্তু শেষে লোকসান হইতে থাকায় কারখানাটি বন্ধ হইয়া যায়। যন্ত্র-দানবের ঔদ্ধত্যের নিদর্শনস্বরূপ বাঁদিকে মাঠের বুকে কারখানার চিমনিটি আজো অভ্রভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কারখানার অট্টালিকাটি কিন্তু পরিত্যক্ত জনমানবশূন্য। সেখানে সারস পাখীর মেলা—ভিটায়

ঘুঘু চরিতেছে। এই ভগ্ন জীর্ণ বিগতশ্রী অট্টালিকার প্রাঙ্গণে ঘুঘুর ডাক মনকে কেমন উদাস করিয়া দেয়। . . . . .

সুবর্ণরেখার উভয় তীরে নিবিড় অরণ্য। বনে ঘনসবুজ বেঁটে খেজুর গাছের প্রাচুর্য্য। মাটির সমস্ত সরসতা আহরণ করিয়া যেন পরিপুষ্ট গাছগুলি প্রবর্দ্ধমান। সুদূরপ্রসারিত নীল পাহাড়ের পটভূমিকায় অর্দ্ধবৃত্তাকার বনের সবুজ সমারোহ চোখ জুড়াইয়া দেয়। দৃষ্টি যেন রং ও রূপের সাগরে অবগাহন করিয়া ধন্য হয়।

বনপথ অতিক্রম করিয়া পাহাড়তলীতে আসিয়া পৌছিলাম। পাহাড়ের উপর নামিয়াছে অপরাহ্ণের ছায়া, চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে অপরূপ স্নিগ্ধতায়।

ছোট একটি পাহাড় অতিক্রম করিলাম। দেখি সুমুখে শষ্পাবৃত একটি উপত্যকা—তারপর অনন্তপ্রসারিত পর্ব্বতমালা সুনীল আকাশের পানে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। পাহাড় ছয় সারিতে বিভক্ত। প্রথম সারি সবুজ, তারপর ধূসর তারপর নীল। পৃথিবীর বক্ষ ভেদ করিয়া বিচিত্র বর্ণ-স্রোত যেন আকাশের নীলিমার অভিমুখে অজস্র ধারায় উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে। পাহাড়ের নীচেকার অংশে খনি। ভিতরকার পাথর তামাটে রঙের—নীচে ছ্যাতলা পড়িয়া যেন অভ্যন্তর-ভাগ সবুজ কার্পেটে মোড়া বলিয়া মনে হইতেছে।

এখানে তাম্র-প্রস্তর গলাইয়া তামা বাহির করা হইত। খনির সুমুখে স্তূপীকৃত তাম্র-মল যেন ছোটখাটো একটি পাহাড়ের সৃষ্টি করিয়াছে। রাখা কথাটার মানে ভস্ম।

খনি দেখিয়া ফিরিতেছিলাম, হঠাৎ দূরাগত, নারীকণ্ঠনিঃসৃত সুললিত সঙ্গীত-ধারায় উৎকর্ণ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। দূরে নীল গিরি-চূড়ার পেছনে সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। অস্তসূর্য্যের শেষ রশ্মিমালা

পার্ব্বত্য-ভূমিতে কেমন যেন একটা উদাস করুণ পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কোন্ অদৃশ্যলোক হইতে ভাসিয়া আসা ঐ সঙ্গীত-ধারা মনকে সুদূরের পানে বিবাগী করিয়া দিল। চাহিয়া দেখি দূরের আকাশস্পর্শী গিরিশিখর হইতে দশ-বারোটি পাহাড়ী মেয়ে পরস্পরের গলা জড়াজড়ি করিয়া গান গাহিতে গাহিতে নীচে নামিয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে গিরি-পথের বাঁকে তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়। আবার পর্ব্বত-সানুদেশে তাহাদের গতিশীল মূর্ত্তিগুলি দৃশ্যমান হয় তাহাদের যেন কোন্ অমর্ত্ত্য লোকের অধিবাসিনী বলিয়া মনে হয়।

পরিপূর্ণ জীবন-রসে ও সঙ্গীতানন্দে ভরপুর গিরিনন্দিনীদের আনন্দময়ী মূর্ত্তিগুলির ছবি মানস-পটে আঁকিয়া লইয়া গিরিবন অতিক্রম-করিয়া পাহাড়তলীর অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

গ্রন্থ পঞ্জী

(1) The Garos by A. Playfair.
(2) The Sema Nagas by J. H Hutton.
(3) The Kacharis by the Rev. S.Endle
(4) A History of Assam by E. A. Gail
(5) The Ao Nagas by J. P. Mills I. C. S.
(6) The Lhota Nagas by J. P Mills
(7) The people of India by H. Risiby
(8) The Meithies by T. C. Hudson
(9) The Naga tribes of Manipur by T. C. Hudson
(10) The Khasis by Major P R T Gurdon
(11) The Mikirs by Edward Stack